সাঁওতালী লোককথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বেস্টবুকস্
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ : সোমেন মুখার্জী

প্রকাশক :
বেস্টবুক্‌স্‌
প্রকাশন বিভাগ
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
কালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
১১, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কল্যাণীয়া

ঝিনুকে

লেখকের অন্যান্য বই—

অসমের লোককথা

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প

কোষ থেকে মানুষ

সবুজবাড়ি ও পরিবেশের গল্প

টাট্টু থেকে ইনস্যাট

অমৃতস্য পুত্রাঃ ইত্যাদি

কিছু কথা

লোককথা হচ্ছে অসংগঠিত জনমানসের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। কোনো একজন বিশেষ-ব্যক্তি এর রচয়িতা নয়, বরং বলা যায়, সমগ্র জনগোষ্ঠীই এগুলি রচনা করেন। সাধারণত নিম্নকোটির জনগোষ্ঠী তাদের চারদিকের চেনাজানা জগৎটাকেই তুলে ধরে এসব রচনার মধ্যে। স্বভাবতই এগুলিতে উচ্চকোটির জনরুচি প্রতিফলিত হয় না। এর মধ্যে তথাকথিত সাহিত্যের লক্ষণ বা অলঙ্কারেরও অভাব থাকে, তবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, সারল্য ও স্বাভাবিকতায় এগুলি 'একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র মতই উজ্জ্বল। সাঁওতালি লোককথাগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলের পাশাপাশি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে এসব লোককথা। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এর কাহিনীর মধ্যে যেমন রয়েছে একটি স্নিগ্ধ কৌতুকের ছোঁয়া তেমনি আছে সাঁওতাল জীবনের সরলতা, সত্যপরায়ণতারও প্রকাশ। পাশাপাশি, উচ্চকোটির জনগোষ্ঠী এবং বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হওয়ার বিরুদ্ধেও রয়েছে ব্যঙ্গের ছলে এক ধরনের প্রতিবাদ। সে কারণেই এগুলি শুধুই তাদের বিশ্বাস, সংস্কার বা রসবোধের কাহিনী নয়, এগুলি প্রতিবাদেরও গল্প। তবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে হয়, এসব প্রতিবাদও এসেছে স্বাভাবিকতারই পথে। তাছাড়া প্রতিটি গল্পের মধ্যেই রয়েছে কাহিনীর

একটি নিটোল রূপ। এ কারণেই এই লোককথাগুলি শুধু ছোটদের ভাল লাগায় না, বড়দেরও ভাবায়।

সাঁওতালদের অরণ্য জীবনের পাশাপাশি তাদের জীবনে আধুনিক সভ্যতার যে অনুপ্রবেশ তারও টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এসব গল্পে কখনও দু'একটি শব্দে কখনও বা কাহিনীর বিস্তারের মধ্যে। তাই এই লোককথাগুলি শুধুই কাহিনী নয়, একটি জনগোষ্ঠীর জীবনবেদও।

গল্পগুলি ছোট-বড় সবারই ভাল লাগবে বলে বিশ্বাস—আর সত্যিই যদি ভাল লাগে তাহলেই সার্থক মনে করব এই গল্পগুলি ফিরে বলার পরিশ্রমকে। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিকতা মনে রাখার মতো। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাই তাকে জানাচ্ছি অভিনন্দনও। এছাড়া বইটির তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সোমনাথ নন্দীর সহায়তা ভোলবার নয়। তাকেও জানাই ধন্যবাদ। এইসঙ্গে বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে কালাচাঁদ ঘোষের আগ্রহ ও আন্তরিকতার কথাও স্মরণ করছি। সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

রাজকুমারের বুদ্ধি খরিদ

সে যে ঠিক কতকাল আগের কথা তা জানা নেই কারো। তবে এটা সত্যি, ঘটেছিল ঘটনাটা। ঘটেছিল যে রাজ্যে তার নামটাও রয়ে গেছে অজানাই—যেমন রাজার নামটাও বলতে পারে না কেউ। তবু শুরুটা এইরকম—এক ছিল রাজা—তার ছিল এক ছেলে। আর সেই ছেলেকে নিয়েই এই গল্প।

রাজার ছেলে—তাই বেড়ে উঠেছে আপন খেয়াল খুশি মতো। রাজা তাকে বলে, পড়, পড়, ওরে পড়। না পড়লে সব জানবি-শুনবি কেমন করে? কেমন করে চালাবি এই রাজ্য?

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। কে শোনে কার কথা। রাজপুত্র থাকে তার আপন খেয়ালে। লেখাপড়ায় মন নেই তার একদম। এতটুকু আগ্রহ নেই তার কোনো কিছু শেখায়।

এইভাবেই দিন কেটে যায়। সে যে কতদিন তার হিসেব রাখেনি কেউ। তবে অনেকগুলো দিন, মাস, বছর পেরিয়ে রাজপুত্র পৌঁছোয় যৌবনে। রাজপুত্র যখন খুব ছোট্টটি ছিল সেই সময়ই রাজা দিয়েছিল তার বিয়ে। আসলে রাজপুত্রের বিয়ের জন্য তো আর কোনো গুণের দরকার হয় না। রাজা চাইলেই হয় তার ছেলের বিয়ে। তা এই রাজপুত্রেরও বিয়ে হয়েছে সেই ছোটবেলায়। তারপর কেটে গেছে এতগুলো বছর—কিন্তু রাজা তাকে বলেই যায়—ওরে পড়, পড়, লিখতে শেখ।

একদিন কিন্তু রাজা ভীষণ রেগে গেল। বেশ কড়া গলায় ছেলেকে বলে, আমি তোকে কতদিন ধরে বলছি লেখাপড়া করতে, কিন্তু তাতে তোর কানই নেই। এতবড় রাজ্যের রাজা আমি। কিন্তু তুই এমনই হাঁদা-গাধা, এই রাজ্য যে তোকেও শাসন করতে হবে সে কথাটা বুঝিস না! আমি যখন থাকব না, তখন তুই রাজ্যটা চালাবি কি করে? তুই রাজার ছেলে, তোর কাছে যখন কোনো গাঁওবুড়ো, কিংবা কোনো দলের নেতা অথবা দেশের মোড়ল আসবে কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলতে, তখন তুই কী করবি? তুই কথা পর্যন্ত বলতে শিখলি না—কেমন করে তাদের সঙ্গে কথা বলবি? তারা যে সমস্যা নিয়ে আসবে কী বিচার করবি তার? আজ, না হয় কাল আমি যখন থাকব না তখন তোর দুর্দশা কী হবে ভেবেছিস একবারও?

সত্যি কথা বলতে কী, রাজার সেদিনের বকুনি রাজপুত্রের মনে বড় লাগল। সে ভাবে, বাবা যা বলছে তা সবই সত্যি। আর দেরি না করে আমি বরং বেরিয়ে পড়ি দেশে দেশে, তাহলেই কিছু না কিছু শিখতে পারব।

এই কথা ভেবে গেঁজে বেশ কিছু টাকা-কড়ি আর তিন টুকরো সোনা নিয়ে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়ল ভ্রমণে। যাবার আগে শুধু বৌকে জানিয়ে গেল কথাটা।

চলতে চলতে অনেক দূর গেল রাজপুত্র। লোকে বলে, অত রাস্তা চলেও রাজপুত্র তেমন কাউকে পেল না যার কাছে কিছু শিখতে পারে। তাই চলা তার আর থামে না।

একদিন শেষে রাজপুত্র বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, ঠিক সেই সময়ই তার নজরে পড়ল একজন চাষী। মাঠে লাঙল দিচ্ছিল

সেই চাষী। তাকে দেখে রাজপুত্র ভাবে, আর কাউকে পাবার আগে বরং এই চাষীর কাছে একটু খৈনি চেয়ে আলাপ শুরু করি।

এই না ভেবে রাজপুত্র চাষীর কাছে চায় একটু খৈনি। তারপর খৈনি খেতে খেতেই শুরু করে আলাপ। বলে, আচ্ছা এ অঞ্চলে কোনো কথাবোধি মানে কথা বলার ওস্তাদ আছে কিনা বলতে পার?

চাষী বলে, কেন কথাবোধির সঙ্গে কী দরকার তোমার?

দেখ, সত্যি কথাই বলছি। আমি হচ্ছি অমুক দেশের তমুক রাজার ছেলে। আমি কিছুই শিখিনি এখনও। তাই কিছু শেখার জন্য বেরিয়েছি দেশ ভ্রমণে। তা এখানে যদি কোনো কথাবোধি থাকে, অথবা তুমি নিজেই যদি জানো, তাহলে আমাকে কিছু শেখাও।

চাষী বলে, হ্যাঁ, সত্যি আমার জ্ঞান আছে। আমি তোমাকে দু'-চারটে জিনিস শেখাতেও পারি, অবশ্য যদি তোমার তা শেখার ইচ্ছে থাকে।

রাজপুত্র বলে, আমি তো শিখতেই চাই। শিখতে চাই বলেই তো এত দূর দেশে এসেছি। এখন বল তোমার কি শেখানোর আছে? তবে প্রথমে একটা কথা জেনে নেই, তুমি কী মাগনা শেখাবে, নাকি এরজন্য কিছু নেবে?

মাগনা শেখাব? না, কখনই নয়। আমার শেখানোর জন্য তোমাকে নিশ্চয় কিছু দিতে হবে।

ঠিক আছে, যদি কিছু দিতে হয় দেব। তুমি আমাকে যতগুলো জিনিস শেখাবে তার প্রত্যেকটার জন্য আমি তোমাকে এক টুকরো করে সোনা দেব।

রাজপুত্রের এ কথার জবাবে চাষী বলে, বেশ, আমি তোমাকে

শেখাব। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু আর যা বলব তা জীবনে ভুলবে না। এখন শোনো, তুমি হচ্ছ রাজপুত্র, তাই কারো বাড়িতে, কিংবা কোনো মোড়ল বা কোনো প্রজার সঙ্গে তোমার দেখা করতে যেতে হতেই পারে। সেখানে গেলে তোমাকে বসার জন্য তারা একটা চাদর, কিংবা চাটাই বা একটা পিঁড়ি পেতে দেবে। তোমাকে বসার জন্য যাই দিক না কেন, বসতে বললেই সঙ্গে সঙ্গে বসবে না। তোমাকে যেটায় বসতে দিয়েছে সেটা একটু টেনে অন্য জায়গায় সরিয়ে তারপর বসবে, কেমন? এই হল প্রথম শিক্ষা। দাও এবার এক টুকরো সোনা। রাজপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে তাই দেয়।

চাষী আবার শুরু করে, এবার আমি তোমাকে আর একটা জিনিস শেখাব। তুমি রাজপুত্র, তোমাকে চান করতে যেতে হবে। তা যেখানেই চান করো না কেন, সব সময় আঘাটায় চান করবে। সবাই যেখানে চান করে ভুলেও সেখানে চান করবে না, কেমন? এই হল দ্বিতীয় শিক্ষা।

রাজপুত্র সোনার দ্বিতীয় টুকরোটা দেয় চাষীকে।

চাষী বলে, আরো একটা জিনিস তোমাকে শেখাবার আছে। তুমি রাজপুত্র, লোকজন তোমার কাছে আসবে কোনো বিরোধ নিয়ে, কিংবা কোনো প্রস্তাব নিয়ে বা কোনো বিষয়ে কথা বলতে। এসব ক্ষেত্রে সবাইকে নিয়ে কথা বলবে। আর এ ব্যাপারে দশ জন বা পঞ্চ জন যা বলবে তাই মেনে নেবে। কখনই নিজের মতটা চাপাবার চেষ্টা করবে না, তাদের কথা মান্যি করবে, কেমন? এই হল আমার তৃতীয় শিক্ষা।

রাজপুত্র এবার চাষীকে সোনার তৃতীয় টুকরোটাও দিয়ে বলে, দেখ, আমার কাছে আর সোনা নেই, আর কী তোমাকে দেব

বলো তো ?

চাষী বলে, তোমার যখন আর সোনা নেই তাহলে আর শিখবে কী করে ? তবে ঠিক আছে, আরো একটা জিনিস তোমাকে শেখাচ্ছি মাগনাই ।

বেশ, শেখাও ।

চাষী বলে, তুমি রাজার ছেলে, সে জন্যই বলছি, কখনই কোনো সময় চট করে রেগে যেয়ো না । রাগ হলেও তা চেপে রাখবে, প্রথমেই শক্তি প্রয়োগ করবে না । আগে অন্য পক্ষের কথা শুনবে তারপর মনে মনে বিচার করবে, কেমন ! প্রথমেই গণ্ডগোলে জড়াবে না । রাগ চেপে রেখে একবার দুবার সংশোধনের সুযোগ দেবে । তাতেও কাজ না হলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো তখন । ব্যস, এটাই তোমাকে মাগনা শিখিয়ে দিলাম । তোমার সব সোনা ফুরিয়ে গেছে তাই, না হলে আমি তোমাকে আরো শেখাতে পারতাম । যাক, এবার তুমি তোমার কাজে যাও, আমিও আমার কাজ করি ।

এই কথার পর রাজপুত্র চলতে থাকল আবার । সে মনে মনে ভাবে কী ছোট ছোট কথা দিয়েই না লোকটা আমায় বোকা বানিয়ে সোনার টুকরোগুলো সব নিয়ে নিল । ও যা বলল, তা সত্যি, না মিথ্যে তাই বা কে জানে ? তারপর আবার নিজেই বলে, যাক, আগে পরীক্ষা করে তো দেখা যাক ।

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলছে রাজপুত্র । একসময় তার খাবার-দাবার সব ফুরিয়ে যায় । তখন ঠিক করে, এই শহর থেকে আগে কিছু খাবার-দাবার কিনে তারপর সে আবার এগোবে । এই ভেবে সে যায় শহরের বাজারে ।

জমজমাট বাজার। চারিদিকে সাজানো-গোছানো দোকান। আর সবাই চেঁচাচ্ছে, এদিকে আসুন, এখানে সব সেরা জিনিস আছে, সস্তায় পাবেন,—এদিকে—এদিকে। কেউ কেউ বলে, না কিনলেন তো কী হলো, বসে একটু তামাক খেয়ে যান। এইসব আর কী!

যাইহোক, অত হল্লার মধ্যে রাজকুমার তো ঢুকল এক দোকানে। দোকানদার তাকে বসতে বলল বিছানো এক কাঁথার ওপর। বসতে গিয়েই রাজকুমারের মনে পড়ল তার ওই চাষী গুরুর কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁথাটাতে একটু টান দিল। আর তখনই দেখতে পেল বেশ একটা বড় গর্তের ওপর বিছানো ছিল কাঁথা। সে যদি সোজাসুজি বসতো তাহলে ওই গর্তে পড়েই হয়তো মরতে হতো তাকে।

রাজকুমার ভাবে, গুরু তাহলে জবর শিক্ষা দিয়েছে। না, সোনা দেওয়া সার্থক। রাজকুমার দোকান থেকে কিছু খাবার-দাবার কিনে আবার চলতে শুরু করে। মনে কিন্তু গুনগুনিয়ে ওঠে শুধুই তার চাষী গুরুর কথাগুলি।

হাঁটতে হাঁটতে সে যে কতদূর এসেছে, তা কে জানে! এক জায়গায় সে দেখতে পেল বেশ বড় একটি পুকুর। পুকুর দেখেই রাজকুমার ভাবে এখানে চানটা সেরে কিছু খেয়ে নি; তারপর আবার আমি চলব নিজের পথে।

পুকুরের কাছে গিয়েই মনে পড়ল তার গুরুর কথা। সঙ্গে সঙ্গে ঘাট ছেড়ে চলে গেল আঘাটায়।

জামাকাপড় এবং অন্যসব জিনিস রেখে রাজকুমার চানটা করে নেয়। তারপর সেখানেই খাওয়া সেরে রওনা হয় পথে।

কিছুদূর গিয়েই মনে পড়ে তার, তাই তো, টাকার গেঁজটাতো সে

ফেলে এসেছে সেই পুকুর পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ ছোট্। গিয়ে দেখে তার গেঁজ রয়েছে তেমনি ভাবে। গেঁজটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে রাজপুত্র ভাবে, গুরু আমার সত্যি জবর। যদি ঘাটে চান করতাম তাহলে এতক্ষণে অন্য কেউ জল নিতে এসে নিয়ে যেত গেঁজ। আঘাটায় চান করার জন্যই ফেরৎ পেলাম টাকা। না, সোনা দেওয়া আমার সার্থক হয়েছে।

রাজপুত্র হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটতে হাঁটতে হয়ে যায় সন্ধ্যে। তখন গাঁয়ের লোকদের কাছে গিয়ে সে শোবার জন্য একটু জায়গা চায়। গাঁয়ের লোক বলে, যাও না গাঁওবুড়োর কাছে। ওখানেই তুমি থাকবে ভালো। তার আছে বেশ বড় চওড়া বারান্দা—কোনো কষ্টই হবে না তোমার।

তাদের কথায় রাজকুমার সত্যি সত্যি যায় গাঁওবুড়োর কাছে। বলে, শোবার জন্য একটু জায়গা পেতে পারি।

নিশ্চয়ই পারো। কিন্তু শুতে হবে বারান্দায়।

তাতেই আমি খুশি।

রাজপুত্রের সে কথায় গাঁওবুড়ো বলে, তবে যাও ওই বারান্দায়—রাহী পথিকদের জন্যই রয়েছে ওটা।

রাজকুমার তাই যায়। সে বারান্দায় গিয়ে দেখে, তার আগেই সেখানে এসেছে আরেকজন। সে এক যোগী। খড় বিছিয়ে সে আয়োজন করছে শোয়ার। রাজকুমার তার কাজে কিছু খড় চায় শোয়ার জন্য। সেও দেয়। তাই বিছিয়েই শুয়ে পড়ে সে।

কপাল মন্দ, ঘুমের মধ্যেই মারা যায় যোগী। সকালে উঠে তাই দেখে গাঁওবুড়ো বলে রাজকুমারকে, দাঁড়াও, এখনই যেও না। ডাকি

পঞ্চজনকে, তারা কী বলে শুনি, তারপর হবে ব্যবস্থা।

সবাই এলে গাঁওবুড়ো বলে, এই দুই বিদেশী এসেছিল কাল রাতে। তারপর কী হয়েছে কে জানে, তবে সকালে দেখছি একজন মারা গেছে। এখন বল সবাই কী করা যায়।

চলল খানিকক্ষণ শলা-পরামর্শ। তারপর ঠিক হয় ছুঁড়ে ফেলে দাও ওই মড়াটা।

কিন্তু ফেলবে কে? একজন বলে, কেন, যে কাল রাতে শুয়েছিল ওর পাশে সেই ফেলুক।

আর সবাই বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ফেলুক। না ফেললে ওর যে অবস্থা হয়েছে এরও সেই হাল করব।

কথাটা শুনে রাজকুমার বলে, তোমরা জান না, আমি একজন রাজকুমার। আমি কেন ফেলব মড়া। আমি পারব না।

রাজকুমারের কথা শেষ হবার আগেই তেড়ে আসে লোকগুলি। আর তখনই তার মনে পড়ে যায় তার গুরুর কথা, পাঁচজনের সিদ্ধান্ত অমান্য কোরো না কখনো। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, না, না, ঠিক আছে, আমিই ফেলে দিচ্ছি ওকে।

মড়াটাকে সে ফেলে দেয় নদীর চরে। বুড়োরা বলে, মড়ার কাপড় খুলে দিতে হয়। রাজকুমার তাই সেই যোগীর কোমরের কশি আলগা করে। আর তখনই দেখে, তার কোমরের গেঁজে রয়েছে অনেক টাকা। রাজকুমার নিয়ে নেয় তা।

এইসব করতে করতেই অবশ্য দুপুর গড়িয়ে যায়। রাজকুমার সেখানেই চান করে, কিছু খেয়ে আবার পাড়ি দেয় পথে।

চলতে চলতে রাত হয়। বেশ গভীর রাত। রাজকুমার অবশ্য

তখন পৌঁছে গেছে নিজের রাজ্যেই। একবার ভাবে সে বাড়ি গিয়ে ঘুমোবে। আবার ভাবে রাতটা বাইরে কাটিয়ে সকালে সে যাবে বাড়ি। সাত-পাঁচ ভেবে শেষে ঠিক করে, না, আজ বাড়িই ফিরব।

তারপর সত্যি সত্যি সে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে সে হাজির হয় তার বাড়িতে। সবাই তখন তলিয়ে রয়েছে ঘুমের সমুদ্রে। রাজকুমার তাই সোজা চলে যায় তার ঘরে যেখানে সে থাকত তার বউয়ের সঙ্গে।

ঘরের কাছে এসেই কিন্তু রাগে জ্বলে ওঠে তার সারা শরীর। মাথায় উঠে যায় রক্ত। তার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে রয়েছে এক-জোড়া জুতো আর একটা তরোয়াল। সে তরোয়ালটা তুলে নেয় খাপসুদ্ধ, তারপর বেশ চেঁচিয়েই বলে, এই, কে, কে ঢুকেছ আমার ঘরে।

এখন ব্যাপারটা হয়েছে কী, সেই ঘরে তখন শুয়েছিল রাজকুমারের বোন আর বউ। রাজকুমার ঘরে নেই বলেই ননদ-বৌদি মিলে ঘুমোতো ওই ঘরে।

তা রাজকুমারের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে যায় দুজনেরই। তারা আলো জ্বালে। রাজকুমারের বোন বলে, বৌদি, দাদা ফিরেছে, আমি তাহলে চলে যাই অন্য ঘরে। এই বলে দরজা খুলতে গিয়ে দেখে তার দাদা দাঁড়িয়ে আছে খোলা তরোয়াল নিয়ে। দেখেই ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে সে বলে, দাদা, ও দাদা, আমি। তুমি বাড়ি ছিলে না বলে, আমি আর বৌদি শুতাম ঘরে। আর কেউ যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে তার জন্যই দরজার কাছে রাখতাম জুতো আর তরোয়াল। ও দাদা, বুঝতে পারছ তো, আমি তোমার বোন। তুমি তরোয়ালটা নামাও।

রাজকুমারের কিন্তু তাতেও হুঁশ হয় না। সে রেগেই বলে, ওসব দাদা ফাদা বুঝি না, আগে বেরোও তারপর দেখছি।

ঘরের মধ্যে বোন কেঁদে বলে, ও বৌদি, দাদা দারুণ রেগেছে, আমাকে কেটেই ফেলবে। বলে সে তার পোশাক ছিঁড়ে তার টুকরো বের করে দেখায় রাজকুমারকে, বলে, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো, আমি তোমার বোন কিনা?

আর ঠিক তখনই রাজকুমারের মনে পড়ে তার গুরুর কথা। মনে পড়তেই কেঁদে ফেলল সে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে সে, কী গাধা আমি, গুরু বলেছিল, রাগকে চেপে রাখতে। অথচ সে কথা না শুনে আজ আমি একটা খুন খারাপি করে ফেলছিলাম। আমার চেয়ে হাঁদা, আমার চেয়ে পাষণ্ড আর কে আছে? এইসব বলে অনেকক্ষণ কাঁদল সে।

একসময় রাজাও আসে। দেখে, শোনে আর বোঝে ছেলে তার বুদ্ধি সওদা করেছে ভালই—এখন তার জ্ঞান হয়েছে বেশ।

এটা যে গল্প নয়, তার প্রমাণ। সাঁওতালরা এখনও কোথাও খেতে বসতে গেলে, যতটুকুই হোক, আসন বা চাটাইটাকে একটু সরাবেই সরাবে।

যাক সে কথা, গল্পটা কিন্তু ঠিক এখানেই শেষ।

যখন খরগোশ খেত বাঘকে

সে যুগের নামটা বলা শক্ত। কতদিন আগে যে ছিল যুগটা, তাও কেউ জানে না। তবে এটা সত্যি, সে-সময় খরগোশে খেত বাঘকে।

তা খরগোশে যে যুগে বাঘকে খেত, সেই যুগে এক গাঁয়ে ছিল এক কামার। কামার তার উনুনের আঁচের জন্য কাঠকয়লা তৈরি করতে যেত বনে। সেদিনও গেছে তাই। আর তখনই ঘটল ব্যাপারটা।

কামার তার কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে কাঠকয়লা তৈরি করবে বলে। এমন সময় একটি বাঘ প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে তার দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ে। কামার দেখে বাঘকে তাড়া করেছে আর একটা খরগোশ।

বাঘটা রয়েছে কামারের পায়ের ফাঁকে লুকিয়ে। খরগোশটা এসে তাকে দেখতে পায় না। ভীষণ রেগে গেছে খরগোশ তাই সে কামার আর বাঘকে ছেড়ে এগিয়ে যায় আরো সামনে।

বাঘটা ততক্ষণে কামারকে বলে, দয়া করে আমাকে লুকিয়ে রাখো। ওই পাজী খরগোশটা দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে আমাকে। কী কথা বলছ না কেন, তুমি আমাকে বাঁচাবে না?

কামার বলে, কখ্খনো নয়। আমি তোমায় বাঁচাই আর তুমি আমাকে খেয়ে ফেলো। না, না, আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারব না।

কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে নিশ্চয়—নিশ্চয়ই খাব না।

বেশ তোমাকে বিশ্বাস করলাম। বিশ্বাস করেই লুকিয়ে রাখছি তোমাকে। তুমি কিন্তু কথা রেখো।

নিশ্চয়ই তোমাকে খাব না। তবে তুমি কিন্তু এ ঘটনার কথা বলতে পারবে না কাউকে। তুমি যদি বলে দাও তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে খাব।

কামার বলে, না না, আমি কাউকে বলব না ব্যাপারটা। বাঘ বলে, আমিও তাহলে খাব না তোমাকে।

বাঘ আর কামার যখন এসব কথা বলছে, সেই সময়ই খরগোশটা আবার আসে। কামার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলে বাঘকে আর কুড়ুলটা ছুঁড়ে মারে খরগোশকে। এক আঘাতেই খরগোশ শেষ।

বাঘের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এবার বেশ জোর পায়, এগিয়ে যায় বনের দিকে। যাবার আগে বলে যায়, মনে থাকে যেন, কাউকে কথাটা বললেই খেয়ে ফেলব তোমায়!

কামার কাঠ থেকে কাঠকয়লা করে সেই খরগোশটাকে কাঁধে ফেলে ঘরে ফেরে দুপুর নাগাদ। কামারের বউ সেই খরগোশটাকে কেটেকুটে সুন্দর করে রান্না করে। তারপর কামার আর বউ খেতে বসে ভাত আর মাংস।

মাংস মুখে দিয়ে কামারের বউয়ের ভারি আনন্দ। এমন ভাল মাংস সে বহুদিন খায়নি। কামারবউ তাই জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগো, এমন খরগোশ তুমি কোথায় পেলে?

কামার কিন্তু কিছু বলে না। সে জানে, বললেই বাঘে তাকে খেয়ে ফেলবে।

কামারকে চুপচাপ থাকতে দেখে তার বউ বলে, বল না, কোথায়

শিকার করলে খরগোশটা। ভারি সুন্দর এটার মাংস। কালকে বরং আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব। আমি কাঠ কাটবো আর সেই ফাঁকে তুমি খরগোশ মারবে কেমন ?

কামার এবার বলে, দেখ, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। কাউকে বলো না যেন কথাটা।

কামারবউ বলে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বারণ করেছ যখন, তখন কাউকে আমি বলব ভেবেছ।

শোন তবে, আজ একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে। এই বলে কামার বলে, একটা বাঘকে তাড়া করেছিল খরগোশটা। বাঘটা তাকে লুকিয়ে রাখতে বললে সে তাই রাখে আর কুড়ুলটা ছুঁড়ে খরগোশটাকে মারতেই সেটা মরে যায়। বাঘ কিন্তু বলেছে, ঘটনাটা কাউকে বললেই খেয়ে ফেলবে সে আমাকে। তাই বলছি, খুব গোপনে রেখ কথাটা।

এখন হয়েছে কি, কামার যখন তার বউকে বলছে কথাটা, সেই সময়ই বাঘটা এসে লুকিয়ে ছিল তাদের বাড়ির কানাচে। শুনেও ফেলে সে সব কথা। তারপর মনে মনেই 'হুম' বলে বসে থাকে সেখানেই।

রাত্রি হয়। কামার কামার-বউ ঘুমিয়ে পড়ে। আর বাঘও ঘরে ঢুকে টুক করে কামারকে মুখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এমনভাবে বাঘটা কামারকে ধরেছিল যে তার গায়ে এতটুকু আঘাত লাগে না। অনেকটা এসে জঙ্গলের মধ্যে বাঘটা কামারকে নামায়। ভয়ে কামারতো ভীষণ কাঁপছে। বিশেষ করে তার পেছন দিকটা কাঁপতে থাকে খুব।

বাঘ কিন্তু তা দেখে অবাক সে বলে, এই, তোমার পেছন দিকটা অত কাঁপছে কেন ?

কামারের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। সে বলে, আমি তো খরগোশটাকে পেটের মধ্যে চালান করেছি। এখন খরগোশটা আমার পেছন দিক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাই এমন কাঁপছে।

খরগোশের নাম শুনেই ভয় পায় বাঘ। বলে, তুমি এখ্‌খুনি ওটাকে ছেড় না যেন। আমি দূরে চলে যাই তারপর তুমি ছেড়।

কামার বলে, তুমি তাহলে শিগ্‌গির পালাও। ওটা বেরুল বলে।

সঙ্গে সঙ্গে কামারকে ফেলে রেখে ছুট লাগায় বাঘ বনের দিকে। আর কামারও হাসতে হাসতে ফিরে আসে ঘরে।

ধন্য বটে মন্ত্রী

এ সেই আদ্দিকালের কথা। তবে ঠিক কোথায়, কোন রাজ্যে যে এ ঘটনা ঘটেছিল তা কেউ জানে না। তবু সবাই বলে ঘটনাটার কথা।

আদ্দিকালের সেই নাম না জানা রাজ্যে ছিল এক রাজা। বিরাট—বিরাট বড় রাজা সে। সারা দেশটারই রাজা ছিল সে।

সারা দেশের সেই একমাত্র রাজার ধন-দৌলত যে কত ছিল তার কোনো লেখাজোখা নেই। অবশ্য থাকবে কি করে? তখন যে লেখা-পড়ার প্রায় চলই ছিল না সে রাজ্যে। তবু বলা হয়, রাজার ছিল অঢেল টাকা, প্রচুর সোনা-দানা, ছিল গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার। রাজার কাছে কাজ করত যে কত লোক তারও নেই কোনো হিসেব। মন্ত্রী, পাইক, পেয়াদা আরও কত কে? সব মিলিয়ে রাজা ভারি সুখী। ভারি আনন্দ তার মনে।

আনন্দের চোটে রাজা রোজই ভাবে, এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে বড় নেই কেউ। আমি—আমিই একমাত্র বড়।

রাজা রোজই ভাবে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না কাউকে কথাটা। আর পারে না বলেই রাজা ভাবে, আচ্ছা, কেউ কি কোনদিন বুঝতে পারবে না আমার মনের কথাটা।

অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা ঠিক করে, না, যাচাই করে দেখতে হবে

একবার—লোকে আমার মনের কথাটা বোঝে কিনা ? এই না ভেবে রাজা একদিন ডাকে তার সব চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে। সবাই হাজির হতেই রাজা বলে, আর কি কেউ বাকি আছে আসতে ?

সবাই বলে, না মহারাজ, একমাত্র প্রজারা ছাড়া সবাই হাজির আমরা। প্রজাদের কি ডাকব ?

না, না, আমি শুধু ডেকেছি তোমাদের। জানতে চাই একটা কথা। আমি যা জিজ্ঞেস করব তোমরা তার উত্তরটা দাও।

বলুন, বলুন মহারাজ।

বলছি। রাজা একটু সময় নেয়। তারপর বলে, আচ্ছা বল তো, আমার মনে কোনো চিন্তা আছে কিনা ? বলতো, আমি কি ভাবছি ?

রাজার এ হেঁয়ালিতে সবাই কেমন যেন ভড়কে যায়। বুঝতে পারে না কি উত্তর দেবে তারা। তাদের ভাব দেখে রাজা বলে, না, না, এখানে একসঙ্গে সবার বলার দরকার নেই। এক এক করে একজন করে বলে যাও তোমরা তোমাদের কথা।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে—একে একে এল সবাই। কেউ কিছু বলল, কেউ একদম চুপচাপ, কিন্তু রাজার মনের কথাটি বলতে পারল না কেউ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রাজা, না, কেউ না, তোমরা কেউ পারলে না, আমার মনের কথাটা বলতে।

রাজা এবার বলে প্রধানমন্ত্রীকে, মন্ত্রী, আমি তোমাকে একমাস সময় দিলাম, এর মধ্যে রাজ্য থেকে তুমি এমন একজনকে ধরে নিয়ে এসো, যে আমার মনের কথাটা বলতে পারে।

রাজার হুকুম পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর চক্ষু চড়কগাছ। এমন লোক সে

কোথায় পাবে—যে বলতে পারবে রাজার মনের কথা ? তবুও, হুকুম যখন রাজার, তখন তামিল করতেই হবে তা। তাই মন্ত্রী শুরু করে তেমন লোকের খোঁজ, যে পারবে রাজার মনের গোপন কথাটি বলতে।

কিন্তু না, তেমন লোক পাওয়া যায় না একটিও। দুর্ভাবনায় মন্ত্রীর ঘুম যায়, খাওয়া বন্ধ হয়। শেষে যখন একমাসের আর দু'দিন বাকি, তখন বন্ধ করে দেয় রাজসভাতেও যাওয়া। সেই ভোরে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বসে মন্ত্রী গালে হাত দিয়ে।

সময় গড়িয়ে যায় মন্ত্রী বসে থাকে ঠায়—সেই একইভাবে। সূর্যি ঠাকুর এবার মাঝ আকাশে বসে কটমট করে চায় চারিদিকে—যেন বলে, দুপুর হ'ল—যাও চান করে সব খেয়ে নাও।

মন্ত্রীর কিন্তু হুঁশ নেই, বসে থাকে সেই একইভাবে। মন্ত্রীর ভাব দেখে তার ছোটমেয়ে এসে বলে, বাবা, কি হয়েছে, কী ভাবছ তুমি সকাল থেকে এখানে বসে বসে ?

মন্ত্রী কোনো কথা বলে না, বসে থাকে সেইভাবেই। মন্ত্রীর মেয়ে বলে, কি হয়েছে, বলবে তো ? আমরাও তো তোমার চিন্তা দূর করতে পারি।

মন্ত্রী চায় মেয়ের দিকে। কথা বলে না একটাও, মেয়ে বলে, বল না, কি হয়েছে ?

মন্ত্রী একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, কি আর বলব ? তুমি তো আমার ছোট্ট মেয়ে, তুমি আর কি করবে ?

তবু বলেই দেখ না, আমি তো একটা কিছু ব্যবস্থা করলেও করতে পারি ?

মেয়ের কথায় এত দুঃখেও হেসে ফেলে মন্ত্রী। তারপর একসময়

বলে তার সংকটের কথা। বলে, আর মাত্র দুদিন সময় আছে, আমি যে কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেয়ে কিন্তু সে কথা শুনে বলে, এই, আমি তো ভেবেছিলাম, কী, না কী? নাও তুমি উঠে চান খাওয়া করে নাও তো। আমি ঠিক দিনে তোমাকে তেমন লোক দিয়ে দেব।

মেয়ের কথায় মন্ত্রী কিছুটা যেন স্বস্তি পায়। তারপরেই ভাবে, মেয়ে হয়তো আমার নাওয়া খাওয়ার জন্য একথা বলল। না হলে আমি মন্ত্রী, আমি খোঁজ পেলাম না এতদিনে, আর ও শুনেই কিনা বলল, তেমন লোক আছে ওর সন্ধানে?

মন্ত্রী আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, যা আছে কপালে তাই হবে। মিথ্যে ভেবে তো কুলকিনারা পাব না, তার চেয়ে চান করে খেয়ে নিই।

দেখতে দেখতে এসে যায় সেই দিন। ঘুম থেকে উঠেই মন্ত্রী বলে মেয়েকে, কইরে, কোথায় তোর সেই লোক?

আছে, তৈরিই আছে। তুমি এখন খেয়েদেয়ে নাও।

মন্ত্রী মনে মনে বলে আর খাওয়া। হয়তো, এটাই শেষ খাওয়া। রাজার মনের কথা বলতে না পারলে প্রাণটা কি আর থাকবে ধড়ে? তবুও মেয়ের কথামতই কাজ করে মন্ত্রী।

ওদিকে মন্ত্রীর মেয়ে ডেকে এনেছে তাদের রাখালকে। বোবা কালা রাখালটা থাকে বাড়ির এক কোণায় আর মন্ত্রীর বাড়ির গরু ছাগল চড়ায়। তিনকুলে ওর থাকার মধ্যে আছে শুধু তিনটি ভেড়া। ওই নিয়েই সুখে থাকে ও।

তা সেই বোবা কালা রাখালকে ডেকে এনে খাইয়ে দাইয়ে মন্ত্রীর

মেয়ে বলে, তোমাকে যেতে হবে বাবার সঙ্গে রাজসভায়। রাজা যা জিজ্ঞেস করবে, উত্তর দিও তার। মাথা নাড়ে রাখাল।

মন্ত্রী ততক্ষণে খেয়েদেয়ে পোশাক পরে তৈরি। হাঁক মেরে বলে মেয়েকে, কইরে, কোথায় তোর লোক। মেয়ে বলে, এই যে বাবা।

রাখালকে দেখেই অনেক দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে মন্ত্রী। বলে, ও যে বোবা, কালা। ও কি করে জবাব দেবে রাজার কথার ?

মেয়ে বলে, বাবা, ও যদি না পারে, তাহলে আর কেউ বলতে পারবে না রাজার মনের কথা, তুমি নিয়েই যাও না কেন!

মন্ত্রীর তখন ডুবন্ত মানুষের কুটো ধরার অবস্থা। ভাবে হবেও বা। তাছাড়া প্রাণটা তো এমনিও যাবে, অমনিও যাবে। তবু দেখা যাক ব্যাপারটা।

সারা রাজ্যের মানুষ সেদিন ভেঙে পড়েছে রাজসভায়। রাজার মনের কথা বলার মতো লোকটি কেমন, কীই বা রাজার মনের কথা তা জানতে সবাই জড়ো হয় রাজসভায়।

ঠিক সময়ে রাজা বসে সিংহাসনে। মন্ত্রী তার আসনে। পাশেই থাকে সেই রাখাল। রাজা বলে, মন্ত্রী, পেয়েছো তেমন লোক।

হ্যাঁ মহারাজ।

হাজির কর তাকে।

রাজার আদেশে মন্ত্রী সেই রাখালকে দাঁড় করিয়ে দেয় রাজার সামনে। রাজা তাকিয়ে থাকে সেই রাখালের দিকে আর বোবা-কালা রাখাল ড্যাবড্যাবিয়ে দেখে রাজাকে।

রাজা হঠাৎ-ই দেখায় তাকে একটি আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে রাখাল দেখায় তাকে দু'টি আঙুল। রাজার মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রাজা এবার তিনটি আঙুল দেখায়।

তিনটি আঙুল দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল কিন্তু জোরে মাথা ঝাঁকায়। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা দেয় মন্ত্রীর বাড়ির সেই কোণের দিকে।

ব্যাপার দেখে মন্ত্রী ভেবে পায় না কিছু! কিন্তু রাজা ভারি খুশি। খুশির হাসিতে মুখটা যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে রাজার। ওদিকে যারা মজা দেখতে এসেছিল তারা কিছু বুঝতে না পেরে মাছের মুখের মতো হাঁ করে থাকে।

রাজা তার পেয়াদাকে বলে, যাও আবার ফিরিয়ে আনো ওই লোকটাকে। দুই পেয়াদা ছোটে। রাখাল কিন্তু কিছুতেই আসে না। রাজা বলে, বেশ ওকে একাই থাকতে দাও।

তারপর মন্ত্রীর দিকে ঘুরে বলে, মন্ত্রী, তুমি ঠিক লোককেই এনেছ। আমি ঠিক যা ভাবছিলাম—তাই বলে দিয়েছে। সত্যি, তুলনা হয় না ওর। আর তুমিও ভারি কাজের মন্ত্রী, বড় কাজের মন্ত্রী। তবে আবারও বলছি, তোমরা এতগুলো লোক পারলে না, কিন্তু দেখ, ও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল আমার মনের কথা।

সত্যি কথা বলতে কি, কি যে ঘটল তা কেউই বুঝতে পারল না। এমন কি মন্ত্রীও মনে মনে বলতে থাকে, ওরা দুজনে দুজনকে শুধু আঙুল দেখাল তাতেই বলা হয়ে গেল মনের কথা! কিন্তু কথাটা যে কি তা তো জানা হল না!

মন্ত্রী ভাবে রাজাকে জিজ্ঞেস করবে, কি করবে না! শেষে জয় হয় কৌতূহলেরই! তাই রাজাকে বলে মন্ত্রী, মহারাজ, অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি।

বলো।

মহারাজ, আপনারা দুজনে যা বুঝতে পারলেন, তা আমরা কেউই কিন্তু বুঝতে পারিনি। তাই কথাটা কি হল, তা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন তাহলে আমার মানে আমাদের সবার বড় সুবিধে হয়।

ও তোমরা বুঝি বুঝতে পারনি। বেশ শোনো তাহলে, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। রাজা বলেন, আমি একটা আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি একা রাজা, না আর কেউ আছে? উত্তরে দুটো আঙুল দেখিয়ে বলল, না, আপনারা দুজন আছেন, আপনি রাজা আর ঠাকুর রাজা। সে কথায় আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনজন রাজা নেই? উত্তরে ও ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না, মাত্র দুজন রাজা—আমি আর ঠাকুর।

সত্যি কথা বলতে কি জান, আমিও দিনরাত ভাবি, এই পৃথিবীতে কি শুধু আমি একাই রাজা? নাকি আর কেউ আছে? কিন্তু ও আমাকে বলে গেল, না, আমরা দুজন রাজা আছি এই বিশ্বে—আমি আর ঠাকুর। সত্যি সত্যিই তাই। এই পৃথিবীতে আমরা দুজনই শুধু বড়।

রাজার কথাটা বিশ্বাস করল মন্ত্রীও। বিশ্বাস করল আর সবাই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সভায় কাজকর্ম সেরে মন্ত্রী ফেরে বাড়িতে। ফিরেই ডাক দেয় সেই বোবা-কালা রাখালকে। রাখাল আসতেই মন্ত্রী জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আজ সকালে রাজা তোমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল আর তুমিই বা কি উত্তর দিলে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না! বলতো কি হয়েছিল?

রাখাল তখন ইঙ্গিতে বলে সব কথা। রাখাল বলে, রাজা আমার

কাছে একটা ভেড়া চাইল। আমি বললাম, তুমি রাজা, একটা নেবে কেন, তুমি দুটো ভেড়া নাও, আমি তোমাকে দুটোই দেব। এবার রাজা তিনটে ভেড়া চাইল। কিন্তু আমার তিনটে ভেড়াই যদি রাজা নিয়ে নেয়, তাহলে আমি থাকব কি করে? তাই ছুটে চলে এলাম রাজসভা থেকে। পেয়াদা আসতেও তাই যাইনি।

রাখালের কথা শুনে মন্ত্রী থ। মন্ত্রী ভাবে, যে যার ভাব বুঝেছে—কিন্তু জান বেঁচেছে তার। আর এটা সম্ভব হয়েছে তার ছোট্ট মেয়েটির জন্যই। মন্ত্রী তাই তার ছোট্ট মেয়েটিকে আদর করতে থাকে আরো—আরো অনেক বেশি করে।

নাপিতের বুদ্ধি

একই গাঁয়ে থাকত সেই নাপিত আর চাষী। দুজনের বাড়ির মাঝখানে ছিল শুধু রাস্তাটা। আর শুধু ওইটুকু তফাতেই তাদের ভাগ্যের ফারাকটা যেন বড্ড বড় হয়ে ওঠে। চাষী ছিল বিরাট ধনী আর নাপিত ছিল তেমনি গরিব। তবু তাদের মধ্যে চেনাশোনা ছিল, কথাবার্তাও হত। আর তা তো হবেই, তারা যে এক গাঁয়েতেই থাকত!

নাপিত ভাবে, চাষী জমি চাষ করে, আমিও করি। কিন্তু ওর জমিতে ফসল হয় উজার করে আর আমার জমিতে ছিটেফোঁটা। ওর বাড়িতে মড়াইয়ের পর মড়াই বাঁধা হয়, আর আমার বাড়িতে মড়াই-গুলো দিনের পর দিন থাকে ফাঁকাই। নাপিত শুধু ভাবে, কেন এমন হয়?

ভাবতে ভাবতে নাপিত ঠিক করে, নিশ্চয় তার চাষবাসের কাজে কোনো ভুল হচ্ছে। চাষীর লোকরা যেভাবে চাষ করে, যে কারণেই হোক, তার লোকেরা সেইভাবে চাষ করে না। আর তাই তার জমিতে ফসল হয় না। দিনের পর দিন গরিব হয়ে যাচ্ছে সে।

নাপিত ভাবে, না, এ বছরে চাষী যেভাবে যা যা চাষ করবে সেও সেইভাবেই করবে চাষ। দেখবে তাতে ফল কোনো হয় কিনা। তাদের মতই চাষ করতে হবে এবার তাকেও।

তাই এক সন্ধ্যেবেলায় নাপিত তার লোকজনকে বলে, এ বছর

আমাদের আর কুঁড়েমি করলে চলবে না। এবার আমাদের দারুণ খাটা খাটতে হবে। দেখ, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে ফাঁকি দিই। আর তার জন্যই আমরা গরিব হয়ে যাচ্ছি। তাই তোমাদের বলছি, এ বছর আমরা প্রত্যেকে যত পারব খাটব, একবার চেষ্টা করে আমাদের দেখতেই হবে আমরা পারি কিনা!

নাপিতের কথা শেষ হতেই সবাই একস্বুরে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমরা খাটব।

সত্যি কথা বলতে কি, সেইদিন থেকে নাপিত রোজই চাষীর বাড়ি যেতে শুরু করল। কখনও খৈনি খেতে, কখনও বা তামাক খেতে। নিজের বাড়িতে খৈনি পাতা, চুন থাকা সত্ত্বেও কখনও সে আসত সেই খৈনি পাতা কিংবা চুনের খোঁজে। নিজের ঘরে আগুন থাকা সত্ত্বেও শুধু হুঁকো নিয়ে চলে আসত টিকে ধরাবার জন্য! আবার কখনও বা চলে আসত শুধুই গল্প করার জন্য। মোটকথা, চাষীর বাড়িতে নাপিতের আনাগোনাটা বেড়ে গেল হঠাৎ-ই। এই যাওয়া আসার মধ্য দিয়েই নাপিত জেনে নিত, শুনে নিত চাষী কি বলে তার লোকদের।

প্রতিদিন চাষী তার লোকজনকে যেমন যেমন নির্দেশ দিত, নাপিতও ফিরে এসে তেমন তেমন বলত। শুধু দিনের বেলা নয়, সন্ধ্যেবেলাতেও নাপিত গিয়ে বসে থাকত চাষীর বাড়ি। শুনে রাখত পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি।

নাপিত শুনেছিল, চাষী অনেক রাত করে ঘুমোতে যায়, তাই সেও রাত করে ঘুমোতে আরম্ভ করল। চাষীর বাড়ীর আলো নিভলে তবে নাপিত নেভাত আলো। ভোরে, যে-সময় চাষী তার গরু বলদ বের করত মাঠে। যে-সময় চাষী জমি চষা শুরু করে ঠিক সেই সময়ে

নাপিতের জমিতেও লাঙল পড়ে। চাষী যে-সময় বলদের কাঁধ থেকে জোয়াল নামায় সেই সময়ই নাপিতও তার হালের বলদকে দেয় রেহাই।

চাষী যখন যে ধরনের জমিতে লাঙল দিতে বলত, যে জমিতে যে বীজ দিতে বলত নাপিতও করত ঠিক তাই তাই। নাপিত যে চাষীর কাছ থেকে জেনে নিয়েই সবকিছু করছে তা কিন্তু চাষী ধরতে পারেনি কিছুতেই। তাই নাপিতের কাজ চলছিল বেশ ভালই।

তারপর একদিন চাষী বুঝতে পারল, তার কাছ থেকে শুনে শুনেই নাপিত চাষ করছে, তবু সে কিছু বলে না নাপিতকে। কিন্তু সে বছর নাপিতের ক্ষেতের ফসল দেখে চাষীর চক্ষু চড়কগাছ। ফসলে ফসলে ভরে গেছে ক্ষেত। এত ফসল, তার জমিতেও হয়নি।

নাপিতেরও মনে আনন্দ আর ধরে না। বাড়ির উঠোনে তার তৈরি হতে থাকে মড়াইয়ের পর মড়াই। তাতে ভর্তি হয় ফসল। আনন্দে নাপিত তার লোকজনদের বলে, দেখলে তো, চাষীর কাছ থেকে শিখে এসে এসে তোমাদের যেমন ভাবে বলতাম তেমনভাবেই চাষ করে কেমন লাভ হয়েছে আমাদের। তবে আমি শেখা বন্ধ করব না কিছুতেই।

আর তাই খুব ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও নাপিত কিন্তু রোজই যায় চাষীর বাড়ি—আগে যেমন যেত। সেটা মাঘ মাস। চাষী তার লোকজনকে বলল, জমি তৈরি কর, এবার আখ লাগাব। বাড়ি ফিরে নাপিতও তার লোকজনকে বলল, এবার আমরা আখ চাষ করব। তোমরা জমি তৈরি শুরু কর।

সত্যি কথা বলতে কি নাপিত তার জমি চষে আখ লাগিয়ে দিল।

আখ চাষ ঠিক কি ভাবে করে তার কিছুই জানে না নাপিত। তবু চাষীর লোকজন যেমন যেমন কাজ করে তেমন ভাবে কাজ করতে থাকে নাপিত।

এক সময় নাপিত আর চাষী—দুজনের ক্ষেতই আখে আখে ভরে যায়। নাপিতের ক্ষেত দেখে চাষীর এবার একটু হিংসে আর রাগ হয়। সে বলে ব্যাটা নাপিত আমার এখান থেকে শুনে শুনে চাষ করে বেশ ভাল ফসল তুলছে। ওকে আজ জব্দ করতে হবে।

সন্ধ্যেবেলা, নাপিত এসেছে চাষীর বাড়ি। চাষী তখন গম্ভীরভাবে তার লোকদের বলে, শোন, কাল সকালে তোমরা আখের জমিতে মই দেবে।

ক্ষেত ভর্তি ফসলে কেউ কোনোদিন মই দেয় না। কিন্তু নাপিত তো চাষের কিছু জানে না, তাই চাষীর চালাকি সে বুঝতে পারল না। পরদিন সকালে সে তার লোকজনদের দিয়ে তার আখের জমিতে বেশ ভাল করে মই দিল। সমস্ত আখ একেবারে মাটির সঙ্গে শুয়ে পড়ল। দূর থেকে তাই দেখে মনের সুখে হেসে নিল চাষী। কেননা, সে তো আর সত্যি সত্যি জমিতে মই দেয়নি।

চাষীর হাসি কিন্তু বেশি দিন রইল না। নাপিত তার ক্ষেতের আখ মাটিতে শুইয়ে দেওয়ায় আখের প্রতিটি গাট থেকে শেকড় গজাতে শুরু করল—প্রতিটি গাঁট থেকে বেরতে থাকল একটি করে গাছ। ফলে তার জমিতে সেবার হল প্রচুর আখ। সত্যি কথা বলতে কি, চাষীর চেয়েও বেশি আখ হল নাপিতের।

কিছুদিন পরে চাষী তার লোকদের বলে, মড়াই খুলে ছোলা বের কর। কাল আমরা ছোলা চাষ করব। আর হ্যাঁ, আজই ছোলাগুলোকে

বেশ করে ভেজে নাও, তাহলে প্রতিটি দানা থেকেই একসঙ্গে বেশ ভাল গাছ হবে। কাল ভোরে, তোমরা ছোলা ভাজার সময় পাবে কোথায় ? ছোলা ভাজার কাজ কালকের জন্য রেখে দিলে কাজে দেরি হয়ে যাবে। যাও, যাও আজই ওটা সেরে রাখ তোমরা।

চাষীর কথা শুনে নাপিত চলে এল বাড়ি। মড়াই খুলে ছোলা বের করে সে তার লোকজনকে বলে ছোলা ভেজে রাখতে। পরদিন সেই ভাজা ছোলাই মাঠে ছড়িয়ে দেয় নাপিত।

এখন চাষী তো আর সত্যি সত্যি ছোলা ভাজে নি, তাই তার ক্ষেতে একই সঙ্গে সমানভাবে সব ছোলা থেকে গাছ বের হতে থাকে। নাপিতের ক্ষেতে এখান-ওখান ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছ হয় হাতে গোনা কয়েকটি।

কারণটা বুঝতে না পেরে নাপিত একদিন চাষীকেই জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তোমার ক্ষেতে এমন সুন্দর ছোলা গাছ বেরিয়েছে, আর আমার ক্ষেতে এমন হল কেন বলত ?

চাষী বলে, ছোলা বুনবার আগে আমরা ওগুলোকে বেশ ভাল করে ভেজে নিয়েছিলাম।

আমিও তো তাই করেছিলাম।

হয়তো ঠিক মতো ভাজা হয়নি। যেগুলো ভালভাবে ভাজা হয়েছে সেগুলো থেকেই এই গাছগুলো বেরিয়েছে। চাষী বেশ গম্ভীর ভাবেই কথাগুলো বলে নাপিতকে।

সেকথা শুনে নাপিতও বলে, বোধহয় তাই হয়েছে। হয়তো ওগুলো ঠিক মতো ভাজা হয়নি।

ঘরে ফিরে নাপিত তার লোকজনকে খুব করে গালাগালি করে।

বলে, একটা কাজও তোমরা ভাল করে করতে পার না। সামান্য ছোলা ভাজার কাজটাও তোমরা জান না। এইসব বলে নাপিত বেশ রাগ করে। তবে ক্ষেতে আর হাত দেয় না সে। যেমন ছোলা ভাজা বুনেছিল সে তেমনই রেখে দেয়।

কিন্তু সে বছর সেই ছোলা থেকেই নাপিতের ক্ষেতে যে পরিমাণ ছোলা হল তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কল্পনা করবে কি করে, ভাজা ছোলায় গাছ কি আগে কখনও হয়েছে ?

চাষীর চেয়েও অনেক অনেক বেশি ছোলা উঠল নাপিতের ঘরে সেবার।

এইভাবে, চাষীর কথা শুনে শুনে চাষ করেই বছর তিন-চারের মধ্যেই নাপিতের অবস্থা গেল ফিরে। সে তখন চাষীর চেয়েও বড়লোক হয়ে যায়। তবে তখনও শেখাটা কিন্তু বন্ধ করে না নাপিত।

রাজা হল রামছাগল

সেটা একটা রামছাগল। যেমনি লম্বা তার দাড়ি, তেমনি বড় তার শিং। গরু ছাগলের পালের মধ্যে তার ওপর নজর সবার পড়বেই। তা একদিন সেই রামছাগল আর অন্য গরু ছাগলের পাল নিয়ে রাখাল যায় অনেক পুরনো এক জঙ্গলে।

জঙ্গলের ঠিক মাঝখানটায় একটা পাহাড়। পাহাড় মানে ঢিবি —তা হাত পনের উঁচু তো হবেই। সেই পাহাড়ের গুহাতেই থাকত একটা বাঘ। রাখাল যখন তার গরু ছাগলের পাল নিয়ে এসেছে বনে, তখন বাঘ গেছে অন্য জায়গায় খাবারের সন্ধানে।

রামছাগলের স্বভাবটাই এই—কোনোকিছু উঁচু দেখলেই সে চড়ে বসবে তাতে। তা পাহাড়টা দেখেই তার মনে জাগল তাতে ওঠার শখ। এক পা দু-পা করে রামছাগল চড়ে বসে একবারে সেই পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ে ওঠার পরই রামছাগলের শুরু হয়ে যায় নাচাকোদা। নাচের চোটে দিন গড়িয়ে যে কখন সন্ধ্যে হয়, তার খেয়াল নেই।

খেয়াল যখন হল তখন রামছাগল দেখে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। তাড়াতাড়ি নামতে যায় সে পাহাড় থেকে। কিন্তু ওঠাটা যত সহজ হয়েছিল, নামাটা তত হয় না। সত্যি কথা বলতে কি সে নামতেই পারে না সেই পাহাড়ের মাথা থেকে। এদিকে রাখাল ছেলেও ভুলে যায় তার কথা। তাই ওই জঙ্গলে—ওই পাহাড়ের মাথায় তাকে

রেখেই বাড়ি ফিরে যায় সে গরু ছাগলের পাল নিয়ে।

গ্রামে ঢুকতে গিয়ে রাখাল ছেলে দেখে, রামছাগলটাই আসেনি। ভয়ে তাড়াতাড়ি সবকটা গরু ছাগলকে বাড়িতে নিয়ে আসে সে। তারপর বলে, বড় রামছাগলটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

সে কথা শুনে তার বাবা বলে, তুমি কোথায় ওদের চড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে? বোধ হয় চিতা কিংবা অন্য কোন জন্তুতে খেয়েছে ওটাকে।

না বাবা, কোন জন্তুতে ওটাকে খেলে আমি জানতে পারতাম। সেদিকে আমি কড়া নজর রেখেছিলাম। আমি ওদের ওই পুরনো জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলাম।

সে কথায় তার বাবা বলে, ওই যেখানে বিরাট পাহাড়টা রয়েছে? ওর গুহাতে তো বাঘ আছে। নির্ঘাৎ বাঘে খেয়েছে রামছাগলটাকে। এরপরই লোকজনকে বলে, যাও, তোমরা সবাই মিলে খুঁজে দেখ ওটাকে।

ওরা সবাই রওনা হয় সেই জঙ্গলে। এদিকে রাতের আঁধার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ ফিরেছে গুহায়। গুহায় ঢুকতে যাবার আগেই পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। ও মাগো! ওটা কি গো! অমন লম্বা লম্বা দাড়ি!

বাঘ দেখে ভয়ে কাঁপছে রামছাগলও। কাঁপার সঙ্গে সঙ্গে দুলছে দাড়ি, নড়ছে শিং। পাহাড়ের মাথায় কাঁপছে রামছাগল আর গুহার মধ্যে ভয়ে প্রায় ভিরমি খায় বাঘ।

কাঁপতে কাঁপতেই বাঘ বলে, 'শুনুন মহারাজ! এখানে কি চান? এটা আমার বাড়ি, চলে যান এখান থেকে।

রামছাগলও বলে, যাব, তার আগে এ জঙ্গলের প্রত্যেকটি বাঘ আর ভল্লুককে খাব। যতক্ষণ না সবকটাকে খাচ্ছি, ততক্ষণ নড়ছি না একপাও।

রামছাগলের সেই কথা শুনে বাঘ আর তাকায় না কোনোদিকে। লেজ তুলে সোজা দেয় ছুট। সে কি ছুট, না দেখলে তা কল্পনাই করা যায় না।

বাঘকে অমন ছুটতে দেখে একটা ভল্লুক তাকে বলে, ওকি খুড়ো, অমন করে ছুটছো কোথায়? বলি হয়েছেটা কি?

হয়েছেটা যে কি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ভাইপো। আমার ডেরায় হানা দিয়েছে একটা জন্তু। আজব •জন্তু সেটা। ইয়া লম্বা তার দাড়ি, লম্বা বর্শার মত পাকানো শিং।

তার সঙ্গে তোমার কি খুড়ো? তুমি তাকে থাকতে দিলেই পারো!

আরে আগে শোনই না কথাটা। আমি তো তাকে বললাম, শুনুন মহারাজ, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? এখানে কি চান? এখন তো রাত, একা একা ভয় লাগছে না আপনার?

বুঝলে ভাইপো, এই কথাগুলো বলেই ভুল করেছিলাম আমি। আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র সেই আজব জন্তু বলে—আমি যদি এই বনের প্রত্যেকটা বাঘ আর ভল্লুককে খেতে না পারি তাহলে বরং উপোস করে থাকব, তবু ছাড়ব না এ জঙ্গল। যেমন করে হোক তাদের সব কটাকে শেষ করব আমি—তার আগে সরব না কিছুতেই। কি বলব ভাইপো, রাগে আজব জন্তুটা কাঁপছিল থরথর করে। তাই না দেখে, কোনো দিকে না তাকিয়ে দিয়েছি ছুট, যদি বাঁচতে চাও তাহলে তুমিও দৌড়োও আমার সঙ্গে।

ভল্লুক বলে, আমার সঙ্গে চল খুড়ো। এখন আমরা তুজন। আমাদের তুজনকে সে নিশ্চরই একসঙ্গে খেতে পারবে না!

বাঘ বলে, হ্যাঁ কথাটা তুমি মন্দ বলনি ভাইপো। তাই চলো।

এবার বাঘ ভাল্লুক ফিরে চলে সেই পাহাড়ের দিকে। তাদের তুজনকে একসঙ্গে ওইভাবে চলতে দেখে পথে এক শেয়াল তাদের বলে, কি ব্যাপার মামা, তোমরা তুজনে জোড় বেঁধে চলেছ কোথায়?

তারা বলে, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ভাগ্নে। একটা রাক্ষস এসেছে আমাদের বাড়ি।

রাক্ষস! কি রকম দেখতে সেটা মামা!

বাঘ বলে, বিচ্ছিরি রকম বড় ভাগ্নে, বিচ্ছিরি রকম বড়।

তা শুনে শেয়াল বলে, তাহলে তো আমাকে যেতে হচ্ছে সেটাকে দেখতে। আর বলি কি মামা, আমরা তিনজনে গেলে নিশ্চয়ই সেটাকে হটিয়ে দিতে পারব সেখান থেকে। তবে একটা কথা।

কি কথা?

আমরা তিনজনে তিনজনের সঙ্গে বাঁধা থাকব। যদি আমাদের মধ্যে কেউ হাঁফিয়ে যায়, তাহলে যার শক্তি বেশি সে পালাতে পারে। এখন আমি হাঁফাতে পারি, তুমি হাঁফিয়ে যেতে পার। তাই তিনজনে যদি তিনজনের সঙ্গে বাঁধা থাকি, তাহলে পালাতে পারবে না কেউ। সে যদি আমাদের কাউকে খায়, তাহলে তিনজনকেই খাবে, আর যদি বেঁচে যাই তাহলে তিনজনেই বাঁচব। এসো আমরা নিজেদের বেঁধেনি।

শেয়ালের কথামত তিনজনে বেঁধে নিল তিনজনকে বেশ শক্ত করে। তারপর তিনজনে মিলে ঢুকল সেই পাহাড়ের গুহায়। রামছাগল যেই বুঝল, তারা এসেছে অমনি ভীষণভাবে গরগর করতে থাকল।

তার সেই নাক ডাকার আওয়াজ পাহাড়ের ওপর আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

সেই আওয়াজ না শুনে বাঘ, ভাল্লুক আর শেয়াল পড়ি কি মরি শুরু করল দৌড়। বাঁধাবাঁধি অবস্থায় দৌড়তে গিয়ে প্রথমেই পড়ে গেল ভল্লুক। কিন্তু ওই অবস্থাতেই তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অন্য দুজনে ছুটতে থাকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ভল্লুক বলে, থাম, থাম, আমার চামড়া উঠে গেল যে! কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাঘ আর শেয়াল দৌড়াতেই থাকে।

একটু পরেই পড়ে যায় শিয়াল। এবার ভাল্লুক আর শেয়াল চিৎকার করতে থাকে—ও ভাল মানুষ খুড়ো, অমন করে টেনো না। আমাদের চামড়াটা উঠে গেল যে।

সে কথায় বাঘ এবার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামড়ে দুজনকেই মেরে ফেলে সে।

আর সেই রামছাগলটা! না, তার কথা আর জানে না কেউ—কেন না, গল্পটার শেষই যে এখানে।

অর্জুনের কেরামতি

অর্জুন তার নাম। থাকত সে এক গাঁয়ে তার বউকে নিয়ে। অর্জুন ছিল খুব খাটিয়ে আর বউ ছিল ঠিক তার উল্টো। কুঁড়ে বলে কুঁড়ে—যাকে বলে রাম কুঁড়ে। ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে ইচ্ছে করে না তার। ঘরদোর কিছুই ঝাঁট দিত না সে। এই নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে চলত তার নিত্য ঝগড়া।

ঝগড়া বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। অর্জুনই তাকে যাচ্ছেতাই করে বকাঝকা করত। কিন্তু বউ তার এমনই যে পাল্টা কথা বলতেও যেন কষ্ট হত তার।

খেতে বসে অর্জুন দেখত খাওয়ার জায়গাটি পর্যন্ত নিকোয়নি তার বউ। তাই ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করত সে। তার বউ কিন্তু এটা নিয়ে লোককে বলত অন্য কথা। সে বলত আমাদের ছেলের বাপ মন্ত্রতন্ত্র জানে গো। খেতে বসে পর্যন্ত ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়বে তারপর খাবে। মুরগি পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ও।

তা এইভাবেই চলছিল দিন। এরই মধ্যে এক রাজ্যে ঘটল এক ঘটনা। সেই দেশেতে এল এক রাক্ষস। ধরে ধরে সে খেয়ে ফেলত মানুষজন, জন্তুজানোয়ার সব। তাই সে দেশে বাস করাটাই হয়ে উঠল মস্ত ভয়ের ব্যাপার।

সব দেখে ঘোষণা করে রাজা, খুঁজে নিয়ে এস কোনো ভাল

ওঝা—যে মন্ত্র পড়ে মারতে পারবে ওই রাক্ষসকে।

রাজার আদেশে দিকে দিকে রওনা হল পেয়াদা। কিন্তু রাক্ষস মারার জন্য সাহসভরে এগিয়ে এল না কোনো ওঝা। কোনো ওঝার খোঁজ না পেয়ে তারা একসময় এল অর্জুনদের গাঁয়ে! জিজ্ঞেস করে সে গাঁয়ে কোনো ভাল ওঝা আছে কিনা।

কেউ কিছু জবাব দেবার আগেই অর্জুনের বউ বলে, আমাদের মরদ ভাল ঝাড়ফুঁক জানে গো।

অর্জুন বলে, ধুৎ, কি যা তা সব বকছ।

অর্জুনের বউ কিন্তু বলে, ওসব বল না, যাও না—অনেক টাকা দেবে।

অর্জুনের কিন্তু একই কথা, ধুৎ, আমি ওসব কিসসু জানি না—আমি যাব না।

তাদের এই কথাবার্তার মধ্যেই দুই পেয়াদা অর্জুনকে ধরে, বলে, চল আমাদের রাজ্যে—মন্ত্র পড়ে মেরে দাও রাক্ষসকে—বাঁচাও আমাদের।

অর্জুন কিন্তু একই কথা বলে, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।

বউ তার বলে, যাও না লক্ষ্মীটি, আর শোনো গরু বাঁধার দড়ি আর কুড়ুলটা নিয়ে যাও সঙ্গে।

পেয়াদা দুজন ততক্ষণে জোর করে ধরেছে অর্জুনকে। বেচারা অর্জুন! দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে যায় তাদের সঙ্গে। তাকে তারা হাজির করে রাজার কাছে।

অর্জুনকে জিজ্ঞেস করে রাজা, রাক্ষসকে মারতে পারবে তো?

অর্জুন বলে, কে জানে! আগে কিছু ক্রিয়াকর্ম করতে হবে,

তারপর বোঝা যাবে পারব কিনা ?

রাজা বলে, খুব ভাল শুরু করে দাও তোমার ক্রিয়াকর্ম।

অর্জুন জানায়, এখানে তো তা করা যাবে না। গাঁয়ের শেষ মাথায় রয়েছে যে বাস্তাটি ওইখানে বসে করব আমি ক্রিয়া।

সবাই মিলে গেল সেই গাঁয়ের সেই শেষ রাস্তায়। অর্জুনেব পেছন পেছন গেল রাজ্যের যত মানুষ। প্রায় মাঝরাতে তারা পৌঁছল গাঁযেব সেই রাস্তার শেষে। অর্জুন বলে, শোন এখন ববং একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক। একটু পরে শুরু করব ক্রিয়া।

অর্জুনের কথায় সবাই শুয়ে পড়ে সেখানে। আসলে অর্জুনের মতলব ছিল সবাই যখন ঘুমিবে পড়বে, সেই সময়েই পালাবে সে সেখান থেকে।

একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। নাক ডাকতে শুরু করে অনেকের। আর সেই তালে দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে চুপিচুপি উঠে পড়ে অর্জুন—পাড়ি দেয় সে রাজ্যের বাইরের দিকে।

এদিকে হয়েছে কি, অর্জুন চলেছে যে পথে, ঠিক তার উল্টো পথ ধরে আসে সেই রাক্ষস। রাস্তার মাঝখানেই মুখোমুখি হয় তারা। রাক্ষসটাকে দেখেই অর্জুন জিজ্ঞেস করে, এই তুমি কে ? কোথায় চলেছ ?

আমি যাচ্ছি মানুষ খেতে। কিন্তু তুমি কে বটে ?

ও! তুমিই সেই। আমি চলেছি তোমারই খোঁজে।

আমার খোঁজ ? মানে ?

ও, তুমি জানো না বুঝি! তোমার মত বহুজনকে যাদু শিখিয়েছি আমি। তোমাকেও আমার যাদু শেখাবার আছে।

সত্যি! শেখাবে আমাকে!

অর্জুন বলে, শেখাব বলেই তো এসেছি। কিন্তু সত্যিই কি তুমি শিখবে?

শিখব, নিশ্চয় শিখব।

শোন, সত্যিই যদি শিখতে চাও, তাহলে একটিও কথা বলবে না, শুধু আমি যা বলব তাই করে যাবে। না হলে, কিন্তু কিছুই শিখতে পারবে না।

রাক্ষস বলে, ঠিক আছে, আমি একটা কথাও বলব না।

ভাল, খুব ভাল। চুপচাপ তাহলে শুয়ে পড় এখানে।

অর্জুনের কথামত শুয়ে পড়ল রাক্ষস। অর্জুন তার চাদর দিয়ে বেশ করে রাক্ষসের মাথাটা মুড়ে ফেলল। সেই গরুর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল তার হাত পা। তারপর তার সেই কুড়ুল দিয়ে সে কোপাতে থাকে সেই রাক্ষসকে। কোপাতে কোপাতে একসময় সে মেরেই ফেলে তাকে।

অর্জুন এবার বীরবিক্রমে ফিরে যায় সেখানে—যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে রাজ্যের যত লোক। চিৎকার করে বলতে থাকে—যত সব অকর্মার ধাড়ি! পড়ে পড়ে সব ঘুম। এমন আহাম্মকদের রাক্ষসে খাবে না তো খাবে কাদের। নাও, এবার দয়া করে সব ওঠ। রাক্ষসটাকে টেনে নিয়ে এসো এখানে।

লোকগুলো উঠে চোখ কচলাতে থাকে। বলে কি লোকটা। রাক্ষসটাকে টেনে আনব। আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে নাকি?

অর্জুন আবার একবার গালাগাল দেয় তাদের। বলা যায় গালাগালি দিয়ে আগাপাস্তল যেন ধুইয়ে দেয়। তারপর বলে, যাও,

গিয়ে দেখই না, আমি রসিকতা করছি কিনা ?

এবার লোকগুলো এগিয়ে যায়। দেখে সত্যিই পড়ে রয়েছে সেই রাক্ষস। এবার পড়ে যায় মহা হৈ চৈ। সবাই মিলে রাক্ষসকে কাঁধে করে নিয়ে হাজির হয় রাজার কাছে।

রাজা এবার মহাখুশি। অর্জুনকে রাজা দেয় পেতলের একঘটি ভর্তি টাকা। টাকা নিয়ে অর্জুন ফিরে আসে ঘরে।

অর্জুনের হাতে ঘটি ভর্তি টাকা দেখে তার বউ বলে, দেখলে তো, না গেলে এই টাকা পেতে ? ভাগ্যিস আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম —তাইতো টাকাটা পেলে। অত কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকলে কি টাকা রোজগার হয়—বেরোতে হয়—বুঝলে, বেরোতে হয়।

বেচারা অর্জুন। রাক্ষস মারতে গিয়ে যে সেই জানে মারা পড়ছিল তা বলারও সুযোগ পেল না। উল্টে তার কুঁড়ে বউ-ই উপদেশ দেয় তাকে কুঁড়ে হলে জোটে না টাকা। হায়রে অদৃষ্ট !

মুরগির 'ফুল' শিয়াল

পুরনো সেই দিনে ছিল এক শিয়াল আর এক মুরগি। শিয়ালে মুরগিতে দারুণ ভাব। দুজনে দুজনের সঙ্গে পাতিয়েছিল ফুল। সব-সময় দেখা যেত দুজনকে একই সঙ্গে।

একদিন শিয়াল বলে, ফুল, আমরা তো একসঙ্গেতেই থাকি। কিন্তু কেউ এখনও কাউকে খাওয়াইনি। তাই বলছি একদিন তুমি এসো আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে।

মুরগি বলে, ঠিকই বলেছ ফুল। তবে একা আমি নয়, তুমিও এসো আমার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে।

হুক্কা হুয়া করে শিয়াল বলে, সে তো খুব ভাল কথা—খুব ভাল কথা।

কোঁকর কোঁ ডাক ছেড়ে মুরগিও বলে, ভারি মজা, ভারি মজা। ফুলের বাড়ি ফুলের নেমন্তন্ন—ভারি খাসা খাওয়া দাওয়া।

শিয়াল বলে, একটা কথা ফুল, খাবার দাবার যাই হোক হাড়িয়াটা কিন্তু ভাল হওয়া চাই। এক কাজ কর, আজ থেকেই তুমি তোমার মতো আর আমি আমার মতো হাড়িয়া তৈরি শুরু করি।

মুরগি বলে, হ্যাঁ, হাড়িয়া পচাতে তো সময় নেবে কয়েক দিন হাড়িয়াটা গেঁজে উঠলেই দিন ঠিক করা যাবে খাওয়া দাওয়ার।

শিয়ালও সায় দেয় মুরগির কথায়। তারপর দুজনে চলে যায় যে যার ডেরায়।

হাড়িয়া তৈরির জন্য মুরগি জোগাড় করে ধান, ভুট্টা, বজরা, যব—এইসব। আসলে মুরগি যেসব খায় তাই দিয়েই সে হাড়িয়া তৈরি করে। অন্যদিকে শিয়াল তার খাবার গিরগিটি, ব্যাঙ, কাঁকড়া, মাছ, গঙ্গাফড়িং এইসব ধরে ধরে হাড়িয়া করতে বসে।

দিন তিন চার পরেই মুরগির হাড়িয়া তৈরি হয়ে যায়। ঢাকনা খুলতেই গন্ধে ম-ম করতে থাকে চারদিক। মুরগি ছোটে শিয়ালের বাড়ি। বলে, ফুল, ফুল, আমার হাড়িয়া তৈরি, তোমারটা হয়েছে কি ? আমি করেছি চাল গমের হাড়িয়া—ভারি সুবাস ছেড়েছে তাতে।

শিয়াল বলে, আমারটাও তৈরি হয়ে গেছে ফুল। তখন মুরগি আর শিয়াল দুজনেই বলে, তাহলে এবার শুরু করা যাক খাওয়া দাওয়া। জল টল ঢেলে সাজিয়ে নি সব।

শিয়াল বলে, ফুল, আমি, বলি কি, আমারটা আগে খাওয়া যাক।

মুরগি বলে, বেশ তো, তাই হবে ফুল। তারপর তারা দুজনে মিলে আসে শিয়ালের বাড়ি। শিয়াল নিয়ে আসে হাড়িয়ার হাঁড়ি। পচা মাছ মাংসের গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে মুরগির। সে কিছুতেই খেতে পারে না শিয়ালের সেই হাড়িয়া। মুরগির হাল দেখে শিয়াল বলে, একি ফুল, তুমি দেখি কিছুই খেলে না।

মুরগি বলে, কিছু মনে করো না ফুল, তোমার হাড়িয়ার গন্ধটা বড় পচা পচা। সত্যি কথা বলতে কি, খেতে গেলেই আমার গাটা গুলিয়ে উঠছে।

শিয়াল তো এসব খেতেই অভ্যস্ত। তাই সে একাই বেশ আয়েস করে সবটা খেয়ে নেয়। মুরগি এবার বলে, ফুল, আমার হাড়িয়াটা কেমন হয়েছে তা একবার চেখে দেখবে চল।

মুরগির বাড়িতে তার তৈরি হাড়িয়ায় মুখ দিয়ে দুজনেই ভারি খুশি। ভারি ভাল হয়েছে হাড়িয়াটা। ফলে দুজনেই প্রাণভরে খেতে থাকে হাড়িয়া।

হাড়িয়া খেতে খেতে মুরগির নেশা হয়ে যায়। তার মাথাটা ঝুলে পড়তে থাকে। নেশা হয় শিয়ালেরও। কিন্তু তারই মধ্যে তার দুষ্টু বুদ্ধিটা চাড়া দিয়ে ওঠে বেশ। সে ভাবে, যে এমন সুন্দর হাড়িয়া করতে পারে, তার মাংসটাও নিশ্চয়ই দারুণ খেতে। আমি আর হাড়িয়া খাব না। মাতাল হয়ে মুরগিটা যখন লুটিয়ে পড়বে সেইসময়ই কপ করে আমি ওটাকেই খেয়ে ফেলব।

ওদিকে মুরগি তখন নেশার ঝোঁকে টালমাটাল। নাচতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই দেখে গান জুড়ে দেয় শিয়াল—

খেয়ো না খেয়ো না মুরগি বাড়ির কানায়
হাসে দেখ শেয়াল তোমারই গানায়।
যেয়ো না কোঁক পাখি ওই পুকুরে
ব্যাঙের ঠ্যাং পাবে নাকো এই দুপুরে
খেয়ো না, খেয়ো না মুরগি আর হাড়িয়া
শেয়াল উঠিছে দেখ খালি হাসিয়া—
হুকক্বা হুয়া ওরে হুকক্বা হুয়া

শেয়ালের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে গিয়ে মুরগি যখন একেবারেই কাৎ—তখন তার ছানারা দেখে, শেয়াল বলছে, কি হল ফুল, ওঠ—এসো আমরা একটু নাচ গান করি।

তার কথা কিন্তু মুরগির কানে যায় না। সে তখন একবারেই বেহুঁশ। শেয়াল এদিক ওদিক তাকিয়েই মুরগির ঘাড়ে দেয় এক

কামড়। তারপর কড়মড় করে চিবিয়ে খায় সেটাকে। তারপর মনের আনন্দে বাড়ি গিয়ে ঠ্যাং-ঠ্যাং তুলে শুয়ে পড়ে শিয়াল। খানা-গানা আর হাড়িয়া সবই আজ বড় জব্বর হয়েছে তার। মাঝেমাঝেই ঠোঁটে জিব বোলায় শিয়াল আর ভাবে, মুরগির মাংসটা বড় খাসা। কাল ওর বাচ্চা ক'টাকেও সাবাড় করব আমি।

ওদিকে মুরগির বাচ্চাগুলো মাকে হারিয়ে একবারেই অনাথ। বাড়ির উঠোনে চক্কর মারতে মারতে তারা বলে, হায়রে, এখন আমাদের কি হবে? ওই শয়তান শেয়ালটা আমাদের মাকে খেয়েছে, কিন্তু ওটাকে আমরা মারব কেমন করে?

আর ঠিক সেই সময়ই শিয়াল হাজির হয় মুরগির বাড়ি। ছানা-গুলোকে দেখে সে বলে, কি হল ভাগ্নাভাগ্নির দল, তোমরা এমন কান্নাকাটি করছ কেন?

কি বলব মামা, কাল আমাদের মা মারা গেছে। এখন আমরা একদম একা, তাই কাঁদছি।

চুকচুক করে ওঠে শিয়াল। বলে, ভারি দুঃখের কথা। তা ভাগ্নাভাগ্নির দল, তোমরা তাহলে রাতে শোও কোথায়?

ওই উনুনের ধারে।

খুব ভাল, খুব ভাল। তা সাবধানে থেক বাছারা। চারিদিকে বড় বিপদ।

এইসব বলে শিয়াল চলে যেতেই মুরগির ছানারা বলে, শয়তান শেয়ালটা এবার আমাদের খাওয়ার মতলব এঁটেছে। তাই জেনে গেল আমরা কোথায় শুই। ঠিক আছে, কালকে ওটা আমাদের মা-কে খেয়েছে, আজ আমরা যেমন করেই হোক ওটাকে মারব। কালকেই

মা একটা ডিম পেড়েছিল, কিন্তু কে ওটাকে তা দেবে। কেই বা ডিম ফোটাবে? ওই ডিমটার সাহায্যেই আমরা হতচ্ছাড়া শিয়ালটাকে মারব।

এইসব যুক্তি করে তারা ডিমটাকে বলে। ও ভাই ডিম, তোমাকে আমরা ওই উনুনের মধ্যে রেখে দেব। যখনই শিয়াল আসবে তখনই তুমি ফেটে ওর চোখে লেগে ওকে কানা করে দেবে। আমরা ওটাকে যেমন করেই হোক মারব। আর ভাই মুষুল, তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকো ওই দরজার কাছে। যেই শেয়ালব্যাটা পালাতে যাবে অমনি ঠাই করে পড়ো ওর মাথায়। আর ভাই যাঁতা তুমি থেকো খিড়কির কাছে—শেয়াল এই পথে এলেই সোজা থেৎলে দিও ওর মাথা আর আমরাও এসে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলব ওটাকে।

ওরা সবাই বলে, কখন, কখন আসবে ব্যাটা শেয়াল?

আজই—আজই রাতে।

ওরা সবাই বলে, খুব ভাল, খুব ভাল, আমরা থাকছি যে যার জায়গায়। আজকেই দফারফা হবে ওই ছোঁচা শেয়ালের।

তারপর সবকিছু ঠিক করে মুরগির ছানাগুলো ছোট্ট একটা কুড়ুল নিয়ে বসে থাকে বাইরে বাড়ির ছাঁচায়।

সন্ধ্যের পর গুটি গুটি শিয়াল যখন এল তখন তারা কেউ কিছু বলে না। শেয়াল সোজা উনুনের কাছে গিয়ে সামনের পা দিয়ে ছাই সরাতে থাকে, আর তখনই ফট করে ডিমটা ফেটে লাগে শিয়ালের চোখে। শিয়াল চারদিকে অন্ধকার দেখে। হুক্কা হুয়া, মরে গেলামরে বলে সে ছুট লাগায়। যেতে গিয়ে দরজার কাছে মুষুলে ধাক্কা খেতেই সেটা ঠাস করে তার মাথায় মারে এক বাড়ি।

কানা শেয়াল তখন পড়িমড়ি করে দৌড় লাগায় খিড়কির দিকে। দরজার কাছে আসতেই যাঁতাটা পড়ে ধাঁই করে তার মাথায়। লুটিয়ে পড়ে শিয়াল আর তখনই মুরগি ছানাগুলো কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে শেষ করে দেয় সেই পাজি শেয়ালকে। গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তারা শিয়ালের মাথার ঘিলু বের করে দেয়। তারপর সেই ঘিলুটা নিয়ে বলে, তুমি যেমন আমাদের মাকে খেয়েছ আমরাও তেমনি খেয়ে নিচ্ছি তোমাকে। পাজি শিয়াল কোথাকার।

কাজের নামে অসুখ

সে এক গাঁয়ের বধূর গল্প। কোন গাঁ তা জিজ্ঞেস করলে অবশ্য বলা যাবে না তার নাম। বউটিরই বা নাম কি তাও বলতে মানা। সত্যি কথা বলতে কি, যা নেই জানা—তার কথা বলা বড় শক্ত। তবে ঘটনাটা বড় মজার।

সেই নাম না জানা গাঁয়ের সেই বউটি আর তার স্বামী ছিল বড় সুখেই। অশান্তি নেই এতটুকু। তবে একেবারে অশান্তি নেই বললে ভুল বলা হবে; আসলে বউটি ছিল বড্ড কুঁড়ে—আর সেটা নিয়েই অশান্তি।

অশান্তি না বলে অবশ্য অ-সুখ বলাই ভাল। যখনই কোনো শক্ত কাজ আসত তখনই বউটির হত অসুখ আর তাতেই বাড়ির সবার অ-সুখ। তারা বুঝে পায় না ব্যামোটা কি? অথচ তখন তারা বউটিকে দেখবে, না সেই কাজ করবে? বিশেষ করে আষাঢ়-শ্রাবণে ধান রোয়ার সময় বউটির ব্যামো হবেই হবে। বিছানায় শুয়ে গোঙাতে থাকবে সে।

বাধ্য হয়েই তাকে ঘরে রেখে সবাই চলে যায় মাঠে। আর সবাই যেই চলে যায়, অমনি উঠে বসে বউটি। ইতি-উতি খুঁজে ভাত আর অন্য খাবার খেয়ে নেয় সে। যেদিন হাঁড়িতে ভাত থাকে না, সেদিন নিজের জন্য চারটি ভাত রেঁধে খেয়ে নেয় সে।

একদিন বউটির শ্বশুর মনে মনে বলে, না, ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে

না। বউকে এবার ওঝা দেখানো উচিত। না হলে লোকে নিন্দে-মন্দ করবে। ওষুধপত্র খাইয়েও যদি কোনো ফল না হয়, তাহলে না হয় ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওর বাপের ঘরে।

এইসব নানা কথা ভেবে বউটির শ্বশুর সত্যি সত্যিই জনা দুই ওঝাকে নিয়ে এল। ওঝারাই যে ঝাড়ফুঁক করে, জরিবুটি দিয়ে রোগ সারায় তাদের। তাই ওঝাদেরই ডেকে নিয়ে এল সেই বউটির শ্বশুর। বলল, ভাল করে দেখুন আপনারা, বউমাটি আমাদের ভুগছে এক অদ্ভুত রোগে। ওর নাড়ী দেখে ব্যবস্থা করুন ওষুধপত্রের। না হলে ওর বাপ-মা শেষে বলবে, কোনো চিকিৎসাই আমরা করিনি ওর।

তার কথায় আসনে বেশ আয়েশ করে বসল দুই ওঝা। তারপর এক ওঝা বউটির হাতটি নিয়ে গম্ভীরভাবে দেখতে থাকল তার নাড়ী। খানিকক্ষণ বাদেই কিন্তু ওঝা একটু মুচকি হেসে দ্বিতীয় ওঝাকে ডেকে বলল, একবার তুমি দেখ।

দ্বিতীয় ওঝাও গম্ভীরভাবে নাড়ী দেখতে দেখতে একটু মুচকি হেসে রেখে দেয় বউটির হাত। তারপর দুজনেই বসে থাকে চুপচাপ।

বউটির শ্বশুর এবার বলে, কী দেখলেন আপনারা? কী হয়েছে বউমার? ওষুধপত্রই বা কী দিতে হবে?

দুই ওঝা গম্ভীরভাবেই বলে, ব্যামোটা বড় শক্ত। বড্ড জটিল রোগটা। ওকে জড়িবুটি গুড়িয়ে খাইয়ে দিন।

তাহলে আপনারা ওষুধ দিন। দয়া করে ভাল করে দিন আমাদের বউমাকে। আমি তো শেকড়-বাকড় কিছুই চিনি না। সেই জন্যই তো আপনাদের ডেকে নিয়ে এলাম। এখন যা করার করুন আপনারা।

দুই ওঝাতে এবার সেই বউটির সামনেই বলতে থাকে। হ্যাঁ ঠিকই

বলেছেন আপনি। ওষুধ দিতে হবে আমাদেরই। আমরা দেবও। তার আগে অবশ্য একটু ঝাড়-ফুঁক করতে হবে—পড়তে হবে কিছু মন্ত্রতন্ত্র। তারপর ওষুধ দিলে তবেই কাজ হবে নিশ্চিত। না হলে ফল হবে না।

বেশ তো যাতে কাজ হয় তাই করুন। আধখেচরা কিছু করার দরকার নেই আপনাদের।

বাড়ির কর্তার কথায়, দুই ওঝাতে এবার বলে, বেশ তাই হবে। আমারই ওষুধ তৈরি করব। তারপর ঝাড়ফুঁক করে দেব সেই ওষুধ।

কর্তা বলে, দয়া করে যা করার তাই করুন। এখন বড় কাজের চাপ। রোগা লোককে একাও বাড়িতে রাখা যায় না—আবার একজনকে যে রেখে যাব তারও উপায় নেই। মাঠে যেতে হয় সবাইকেই দয়া করে তাড়াতাড়ি ওষুধটা দিন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ আমরা ওষুধটা খুঁজে পেতে তৈরি করি—তারপর কাল দেব সেই ওষুধ। বলেই দুই ওঝা গাঁয়ের পথ ধরে। তাদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে চলে বাড়ির কর্তা।

কিছুদুর এসে দুই ওঝা বলে, আপনার বউমার কিচ্ছু হয়নি, হয়েছে কুঁড়েমির জ্বর।

তাহলে সে রোগ ভাল করব কি করে।

সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। ও রোগও সারিয়ে দেব আমরাই। এই রোগেরও জবর দাওয়াই জানা আছে আমাদের। আপনি শুধু চুপচাপ থাকবেন। কাউকে জানাবেন না এসব কথা।

সেই মতো কর্তা চুপচাপ আর দুই ওঝা বনে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বের করে বিরাট দুই 'পটলকোঙা', মানে মেটে আলু। এক একটা আলু কুমড়োর মতো বড়। সেই পটলকোঙা নিয়ে ওঝারা চলে আসে ঘরে।

তারপর যখন সন্ধ্যে হল, তখন তারা দুজনে আবার গেল সেই বউটির বাড়ি। বাড়ির কর্তাকে ডেকে তারা বলে, ওষুধ আমরা পেয়েছি। কালকেই দেব সেই ওষুধ। খুব ভোরে দেব সেই ওষুধ। কিন্তু মনে রাখবেন, এখানে নয়। ওষুধ দেব গাঁয়ের সেই শেষ তেমাথায়। ওইখানেতেই আপনাদের সবাইকে ঝাড়ফুঁক করে ওষুধ দেব আমরা বউমাকে। আজকেই জানিয়ে গেলাম, কাল ভোরে বাড়ির কেউ যেন যাবেন না অন্য কোনোখানে।

বাড়ির সবাই বলে, না, না, কোথাও যাব না আমরা। ভোর-বেলাতেই হাজির হব ওই তেমাথায়।

ঠিক আছে, আমরাও সেই ভোরেই যাব সেখানে। কথা ঠিকঠাক। ওঝারা এবার সেখানেই রাতের খাওয়া সেরে ফেরে নিজেদের ঘরে।

পরদিন সেই মোরগডাকা ভোরে দুই ওঝা প্রথমেই সেই 'পটল-কোণ্ডা' দু'টো রেখে আসে গাঁয়ের সেই তেমাথায়। তারপর সেই বউটির বাড়ি গিয়ে ডেকে তোলে সবাইকে।

দুই ওঝা এবার পেতলের এক গ্লাসে করে জল, কিছুটা সিঁদুর আর একটা ভাঙা কুলো নিয়ে সবাইকে আসতে বলল তাদের সঙ্গে।

গাঁয়ের সেই তেমাথায় তারা সেই ভাঙা কুলোর ওপর বসায় বউটিকে। সিঁদুর নিয়ে তার মুখকে করে চিত্রবিচিত্র। তারপর উৎকট সব মন্ত্র পড়ে শুরু করে ঝাড়ফুঁক।

কিছুক্ষণ পরে তারা সেই 'পটলকোণ্ডা' দুটোকে নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দেয় বউটির গলার দুদিকে। তারপর বলে, বউমা, এবার ঠিক এইভাবে গাঁয়ের এই রাস্তা ধরে তিনবার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত যাও। যতক্ষণ না তোমার তিনবার যাওয়া আসা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা

এইভাবে বসে থাকব এখানে। মনে রেখ তিনবার তুমি এই রাস্তা ধরে সারা গাঁ ঘোরার পরই আমরা উঠতে পারব।

সেই সাত সকালে অমন অদ্ভুতভাবে বউটি হাঁটতে থাকল গাঁয়ের পথ ধরে। তার গলায় ঝুলতে থাকল দুটি ঢাউস মেটে আলু। তার সারা মুখে সিঁদুর। ওই বিচিত্র রূপ দেখে সবাই হাসতে থাকল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত তার পেছন পেছন হাততালি দিয়ে চলতে থাকল। সব মিলিয়ে বউটি লজ্জায় একেবারে জেরবার।

দুই ওঝা কিন্তু তখনও তাকে বলে, যতক্ষণ না তুমি পুরোপুরি সেরে যাচ্ছ, যতক্ষণ না রোগের ভূত নামছে তোমার ঘাড় থেকে ততক্ষণ কিন্তু এই ওষুধ ঝুলবে তোমার গলায়। যখন তোমার মনে হবে পুরোপুরি সেরে গেছ তুমি, তখনই গলা থেকে খুলে ফেল এই পটলকোণ্ডা।

এখন বউটি চলে আর পেছনে ওঠে হাসির হর্‌রা। এইভাবে দুবার গাঁয়ের পথে ঘোরার পর বউটি আর পারে না। গলা থেকে সেই পটলকোণ্ডা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে তারপর ছুটে চলে যায় ঘরে।

দুই ওঝাও যায় তার পিছু পিছু। ঘরে গিয়ে তারা বউটিকে বলে, কী বউমা, অত তাড়াতাড়ি তুমি ভাল হয়ে গেলে, নাকি এমনি ও দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বউটি এবার হেসে ফেলে। দুই ওঝা বলে, মনে রেখ, আবার যদি তোমার এমন অসুখ হয়—তাহলে কিন্তু আবার দেব এই ওষুধ। জানো তো আমরা সব রোগ ধরতে পারি।

সেদিন থেকে সেই গাঁয়ের বধূ পুরোপুরি ভাল হয়ে গেল। আর নেই তার কুঁড়েমি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সেও খাটে সমানভাবে। তাই দেখে খুশি তার শ্বশুরঘরের লোকেরাও।

আর ছাগল চুরি নয়

সেই সেকালেবই গল্প। অনেক অনেক দিন আগে এক গাঁয়েতে একজনের একটা ছাগল হঠাৎ-ই ঢুকে পড়ে অন্য একজনের বাড়ি। যেই না ছাগলটা ঢুকেছে সেই বাড়িতে অমনি সে বাড়ির মালিক মেরে ফেলে সেই ছাগলটাকে।

সন্ধ্যে হয়। তারারা মিটমিট করে জ্বলে ওঠে আকাশে। যার ছাগল—সে ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ছাগলেব খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতেই সে আসে সেই লোকটির বাড়ি। বলে, আমার ছাগলটাকে দেখেছ? সেটা তোমাদের ছাগলের পালের সঙ্গে এখানে চলে আসেনি তো?

ছাগলটাকে মেরেছিল যে লোকটি সে বেশ ভাল মানুষের মতোই বলে, কে জানে, সত্যিই তোমার ছাগলটা আমার ছাগলের পালের সঙ্গে এসেছে কিনা? তা এক কাজ কর তুমি। এই আলোটা নিয়ে একবার বরং দেখে এসো আমার ছাগল রাখার জায়গাটা।

সে কথায় লণ্ঠন নিয়ে লোকটি যায় ছাগল রাখার জায়গায়। ভাল করে দেখে সে সবকটা ছাগলকে। না, তারটি নেই কোথাও।

আসলে থাকবে কী করে? লোকটি তো আগেই সেটিকে মেরে রেখে দিয়েছে অন্য জায়গায়। বেচারা ছাগলের মালিক, ছাগলের খোঁজ না পেয়ে চলে যায় শুকনো মুখে।

লোকটা চলে যেতেই সেই লোকটি টেনে বের করে সেই

ছাগলটাকে। তারপর বেশ ভাল করে কেটেকুটে কিছুটা মাংস রেখে দেয় আর বাকিটা রান্না করে সেই রাতেই।

সে রাতে তাদের বাড়িতে হল দারুণ ভোজ। মাংস দিয়ে বেশ জবর খাওয়া হল তাদের। তারপর লোকটি তার ছেলেকে বলে, শোন ছেলে, ছাগলের মাংসটা তোফা। কিন্তু খবরদার, কাল ছাগল চরাতে গিয়ে ভুলেও যেন ওই লোকটার ছেলেদের আশেপাশে যেও না। তারা কিন্তু তোমার গা থেকে ছাগলের মাংসের গন্ধ পাবে। তাহলেই ধরা পড়ে যাব আমরা।

সে রাতে বাপের ওই কথার উত্তরে ছেলে রা কাড়ে না একটাও।

পরদিন সকালে লোকটির ছেলে গরু-বাছুর, ছাগল নিয়ে যায় গাঁয়ের সেই মাঠটাতে—যেখানে গাঁয়ের সবাই চরায় তাদের গরু ছাগল।

ওই মাঠেতে গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে ছেলেরা রোজই খেলা করে। কিন্তু সেদিন সেই ছেলেটির কাছে যখনই কেউ আসে অমনি সে দূরে সরে যায়। ছেলেটি সরে যাচ্ছে দেখে, অন্যরা খালি আসতে থাকে তার কাছে। তাই দেখে বিরক্ত হয়ে সে বলে—খুব সাবধান, তোমরা কেউ আমার কাছে এসো না। তাহলেই কিন্তু গন্ধ পেয়ে যাবে।

গন্ধ, কিসের গন্ধ পাব আমরা? ছেলেগুলিই এবার প্রশ্ন করে।

কেন ছাগলের মাংসের। কাল রাতে আমি ছাগলের মাংস খেয়েছি। বাড়িতে এখনও কিছুটা মাংস রয়েছে। আজ ফিরে গিয়ে আবার আমি মাংস খাব।

সেই ছাগলের মালিকের ছেলেরা একথা শুনে তাদের বাড়িতে বলে দেয় সব। সবাই মিলে তখন চড়াও হয় সেই লোকটির বাড়ি। তল্লাস করে সত্যিই পাওয়া যায় কিছুটা মাংস। তখন পাঁচজন মিলে পাঁচসিকে

জরিমানা করে তার। শুধু তাই নয়, তার একটা ছাগলও দিতে হয় সেই লোকটিকে।

এবার সেই লোকটি ভাবে অন্যের ছাগল খাওয়ার ফল পাওয়া গেল দেখি হাতে হাতেই। আর কখনও অন্যের ছাগল চুরি করে খাওয়া নয়। বিশেষ করে তার ঘরে যখন রয়েছে অমন হাঁদা গঙ্গারাম একটি ছেলে।

চিতা আর ব্যাপারীরা

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। হ্যাঁ, বুড়ো বুড়িরা ঠিক এইভাবেই শুরু করে গল্পটা।

পুরনো সেই অনেক অনেক দিন আগে—জঙ্গলে ছিল এক চিতা বাঘ। ভারি পেটুক সেই চিতা। বনের পশু মেরে তো সে খেতই, সুযোগ পেলেই হানা দিত গাঁয়েও। টেনে নিত গরু ছাগল, ভেড়া কিংবা মোষ। শুধু তাই নয়, বাদ দিত না মানুষজনকেও। যত খায় ততই যেন চাগার দিয়ে ওঠে তার খিদে।

চিতার অত্যাচারে তিতিবিরক্ত গাঁয়ের মানুষজন। ভাবে একটা বিহিত করতেই হবে এর। কথাটা শুনে গাঁওবুড়ো, মানে মোড়ল বলে, বিহিত মানে তো মেরে ফেলা।

সবাই মিলে বলে, হ্যাঁ মেরেই ফেলতে হবে ওই হতচ্ছাড়া চিতাকে। ওর জন্য জঙ্গলে ঢোকা হয়েছে দায়। তাল পেলেই টেনে নেবে একে-ওকে। গাঁয়ে যে ঠিকভাবে থাকব তারও উপায় নেই—হামলা চালাবে যখন তখন। তাই ওকে মেরেই ফেলতে হবে।

গাঁয়ের লোকেরা চিতাকে মারবার জন্য নানা ফন্দি আঁটতে থাকে। কিন্তু এমনই চালাক সেই চিতা, কোন ফাঁকে ঠিক সেই জাল কেটে বেরিয়ে যায়।

এবার ঠিক হয়, এইভাবে নয়। আশপাশের সব গাঁয়ের লোক মিলে ঘিরে ফেলবে ওই জঙ্গল। সবাই মিলে কেটে সাফ করবে বন,

দেখবে কোথায় লুকিয়ে প্রাণ বাঁচায় ওই চোর চিতা।

কথামত গাঁয়ে গাঁয়ে পড়ে গেল ঢেঁড়া। অমুক দিনে মারা হবে চিতাটাকে—সবাই হাজির হও হাতিয়ার নিয়ে।

তারপর—ঠিক সেই দিনটাতে নানা গাঁ থেকে এসে হাজির হয় অনেক অনেক লোক। কারো হাতে কুড়ুল, কারো হাতে দা। কেউ এনেছে কাস্তে আবার কেউবা তীর ধনুক। সব মিলিয়ে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

অত মানুষজন মিলে বন ঘিরে ধরেছে দেখে ভয় পেয়ে যায় চিতা। ভাবে এবার বুঝি সত্যিই জানটা যাবে তার। কোনোমতেই রেহাই পাওয়া যাবে না এই রাগী মানুষগুলোর কাছ থেকে।

চিতা ভয় পায়, কিন্তু আশা ছাড়ে না। কেন না সে জানে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ। আগেই হাল ছেড়ে দিলে মরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা থাকবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচার একটা সড়ক মিলে গেলেও যেতে পারে। তাই ফাঁক ফোঁকর খোঁজে চিতা। চিতা ভাবে, লোকগুলো একদিনই এসেছে তাকে মারতে। আজ যদি কোনোরকমে বেঁচে যায় তাহলে বেঁচেই গেল সে। রোজ রোজ তো আর আসবে না ওরা।

বনের মাঝখান দিয়েই গেছে এক রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল তখন একদল লোক তাদের গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে। রাস্তা জুড়ে চলেছে ওইসব গরু ভেড়া। পেছনে পেছনে লোকগুলো। ওদের দেখে চিতার প্রাণে বুঝি জ্বলে ওঠে আশার প্রদীপটা। মনের ভয়টাকে চেপে রেখে সে সোজা এসে হাজির হয় লোকগুলোর সামনে।

চিতাকে দেখে তো ভয়ে সিঁটিয়ে যায় লোকগুলো। আড়চোখে তাদের সেই ভয় ভয় ভাবটা দেখে চিতা বলে, এই লোকগুলো, তোমরা যদি আমার একটা উপকার কর তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। কিন্তু আমার কথায় রাজি যদি না হও তাহলে তোমাদের গরু ভেড়াকে খাব, তোমাদেরও খাব। বল, রাজি কিনা?

লোকগুলো বলে, কথাটা কি তাই তো জানলাম না এখনও?

ও বলিনি বুঝি? তা শোন, বেশ গম্ভীরভাবেই বলে চিতা। আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই জঙ্গলটাকেই ঘিরে ধরেছে গাঁয়ের লোক। এখন তোমরা যদি আমাকে বাঁচাতে পার, তাহলে ভাল। নাহলে, বুঝতেই পারছ—বলেই চিতা হাই তোলার ছলে তার ছুঁচলো দাঁতগুলো আর হাত পায়ের নখগুলো দেখায়।

লোকগুলো বলে, বলো তোমার কথা। শোনাই যাক!

চিতা বলে, দেখ, আমি হচ্ছি এই বনের রাজা। তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে তোমাদের সুখের সীমা পরিসীমা থাকবে না। আর যদি কথা না শোন তাহলে তোমাদের সামনে হাজির হবে ভয়ঙ্কর—মানে বুঝতেই পারছ—মৃত্যু। শুধু তোমরা নয়, তোমাদের এই যে গরুবাছুর, ছাগল ভেড়া—কেউ রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে।

চিতার কথা শুনে লোকগুলো বলে, এত ভয় দেখাবার কি আছে, তোমার কথাটাই আগে বল, আমরা শুনি, তারপর তো কথা দেওয়ার পালা।

চিতা বলে, দেখ, আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা সব ভাল মানুষের ছা। কিন্তু ওই সব গাঁয়ের লোকগুলো, ওরা দারুণ বদ। ওরা সবাই

মিলে আজ আমাকে মারবার ফন্দি এঁটেছে। আর তাই আমি তোমাদের অনুনয় করছি, না, অনুনয় নয়, হুকুম করছি, তোমরা যদি আজ আমাকে ওই মারকুটে লোকদের হাত থেকে বাঁচাও তাহলে তোমাদের খুব ভাল হবে। আমি জানি, করুণায় গলে যাচ্ছে তোমাদের মন। তাই বলছি, আমাকে লুকিয়ে রাখো, বাঁচাও।

লোকগুলো বলে, কেমন করে ?

তোমাদের ওই যে জিনিসপত্রে ভরা বস্তাটা রয়েছে ওর থেকে জিনিসগুলো ফেলে পুরে ফেল আমাকে—তারপর ওই মারকুটে লোক-গুলো চলে গেলেই ছেড়ে দেবে আমাকে। ব্যস, এইটুকু শুধু কাজ।

ওই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে খানিকটা শলাপরামর্শ করে। তারপর চিতাকে বলে, দেখ, তোমার কথায় আমরা রাজি। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে, আর কোনো দিনই, কি দিনে, কি রাতে—আমরা ব্যাপারীরা যখন এই বন দিয়ে যাব তুমি আমাদের কাউকে খাবে না, ভয় দেখাবে না, একটা আঁচড়ও কাটবে না আমাদের কিংবা আমাদের এইসব গরু ভেড়ার ওপর।

ওদের কথা শেষ হবার আগেই চিতা বলে, আর এই কথাটাই তো আমি আগে বললাম, তোমরা যদি আজ আমাকে বাঁচাও, তাহলে জীবনভর আমাদের মধ্যে থাকবে এই কথা। কোনো দিন, সে গভীর কালো অন্ধকার রাতই হোক, আর আলো ঝলমল দিনই হোক, তোমাদের আমি কিচ্ছুটি বলব না। কোনরকম ভয়তরাস না করে বুক ফুলিয়ে সোজা তোমরা চলে যাবে আমার এই বনের মধ্য দিয়ে।

চিতার কাছ থেকে কথা পেয়ে ব্যাপারীরা এবার বস্তা থেকে সব জিনিসপত্র বের করে চিতাটাকে তার মধ্যে পুরে ফেলে। তারপর

একটা বলদের পিঠে বেশ আচ্ছা করে বেঁধে তারা চলতে থাকে। একসময় শেষ হয় বন। ওদিকে সেই সাত গাঁয়ের মানুষজন সারা বন ঢুরেও চিতাকে না পেয়ে ফিরে যায় যে যার ঘরে।

লোকগুলো এবার চিতাকে বলে, দেখ, আমরা তোমাকে সেই বন পার করে অন্য বনে নিয়ে এসেছি। আর সেই লোকজন তারাও চলে গেছে যে যার ঘরে।

তাহলে এবার আমাকে বস্তা থেকে বের করে দাও?

লোকগুলো চিতাকে বস্তা থেকে বার করতেই সে আড়মোড়া ভেঙে বলে, তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ সত্যিই। আমিও সত্যিই বলছি, আমার দারুণ খিদে পেয়েছে, এবার আমি তোমাদের খাব। তোমাদের গরু-বাছুর খাব, তারপর তোমাদেরও খাব।

চিতার এই ভোল বদলানো দেখে আকাশ থেকে পড়ল লোকগুলি। তারা বলে, তুমি বলেছিলে, তোমাকে বাঁচালে আমরা সুখে থাকব। কিন্তু এই কি সুখ?

মরলে পরে তো সব দুঃখই ঘুচে যায়। তার চেয়ে বড় আর কোনো সুখ হতে পারে বল?

চিতার কথায় লোকগুলি বুঝতে পারে, মহা ধূর্ত এই চিতা। এর হাত থেকে বাঁচার আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই সামনে। তাই ভয় জড়ানো গলায় তারা বলে, দেখ, তুমি আমাদের নিশ্চয় খাবে, কিন্তু তার আগে আরো কয়েকজনের মত নেওয়া যাক। তারা যদি তোমার কথাতেই সায় দেয়—তাহলে দয়া করে তুমি আমাদের নিশ্চয়ই খাবে—দেখ তখন আর কোনো ওজর আপত্তি তুলব না আমরা।

লোকগুলির কথা মেনে নেয় চিতা। বলে, বেশ, কার কাছে যাবে

বল। যাওয়া যাক সেখানেই।

লোকগুলি চারদিকে তাকায়। কিন্তু বিচার করতে পারে এমন কাউকে দেখতে পায় না আশেপাশে। শেষে একটা মহুয়া গাছ দেখতে পেয়ে তারা বলে, বেশ, জিজ্ঞেস করা যাক একেই।

চিতা বলে, বেশ তো, সাক্ষি মানো তোমরা এই মহুয়াকেই।

তাদের কথা শুনতে পেয়ে মহুয়াই বলে, বলি হয়েছে কি? এত গোল কিসের?

ব্যাপারীরা বলে, মহুয়া, ও মহুয়া গাছ, তোমাকে বিচাব করতে হবে একটা।

বেশ তো, বল কাণ্ডটা কি? আমি বিচার করে দিচ্ছি এক নিমিষে।

ব্যাপারীরা বলতে থাকে, দেখ এই চিতাকে, একে মারতে জঙ্গল ঘিরেছিল একদল লোক। তাদের হাত থেকে আমরা একে বাঁচিয়েছি। বাঁচিয়েছি যে, তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তখন চিতাটি বলেছিল, তোমরা আমাকে এবারের মতো বাঁচাও আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না, কখখনো খাব না তোমাদের। কিন্তু এখন বলছে, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই খাব। মহুয়া গাছ, তুমিই বল, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এব একটা বিচার কর তুমি।

মহুয়া গাছ ডালপালা দুলিয়ে বলে, হ্যাঁ এই চিতা তোমাদের নিশ্চয়ই খাবে। তোমরা মানুষরা বড় অকৃতজ্ঞ। তোমরা গাছের ছায়ায় বসো—কিন্তু সেই গাছের ওপর তোমরা কুড়ুল চালাও। গাছের শেকড় বাকড়ের ওপরও নেমে আসে তোমাদের কুড়ুল। তাই বলছি, ওই চিতা নিশ্চয়ই খাবে তোমাদের।

মহুয়ার কথা শুনে মুখ শুকিয়ে যায় ব্যাপারীদের। চিতা একটা ডিগবাজি খেয়ে বলে, বিচারের রায় শুনলে তো। আমি নিশ্চয়ই খাব তোমাদেব।

ব্যাপারীরা বলে, দাঁড়াও, আরো দুজনেব রায় শোনা যাক। তারাও যদি একই কথা বলে তখন তুমি আমাদের খেয়ো, একটা কথাও বলব না তখন।

চিতা বলে, বেশ, চল তবে এগোনো যাক।

চলতে থাকে তারা! কিছুটা গিয়েই চোখে পড়ে একটা পুকুর। ওরা বলে, চল এবার তাহলে জিজ্ঞেস করা যাক এই পুকুরটাকেই।

ওরা এগিয়ে যায় পুকুরের কাছে। বলে, ওগো পুকুর, আমাদের কথাটা শুনে তুমি একটা বিচার করে দাও তো?

কি কথা তোমাদের?

ওবা এই চিতাটাকে মারতে চাইছিল। সেইসময় ও আমাদের বলে, আমাকে বাঁচাও, জীবনে আমি তোমাদের খাব না। আমরা ওকে বাঁচাই। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ ওকে। কিন্তু এখন বলছে, ও আমাদের খাবে। এখন তুমিই বিচার কর, এটা কী ঠিক হচ্ছে।

পুকুর জলে কোনো ঢেউ না তুলেই বলে, ও নিশ্চয়ই তোমাদের খাবে। তোমরা মানুষরা বড্ড পাজি। তোমরা আমার জল খাও, আবার আমার জলেই তোমরা ময়লাটয়লাও ফেল। তাই ও তোমাদের নিশ্চয়ই খাবে।

পুকুরের মত শুনে তো লোকগুলোর অজ্ঞান হবার অবস্থা। চিতা আরেক পাক ঘুরে বলে, তাহলে বুঝেছ, আমি তোমাদের খাবই খাব, ওরা দুজনেই বলেছে। তোমাদের খেয়ে ফেলাই উচিত আমার।

লোকগুলো মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ তা বলেছে সত্যি। তবু আরো একজন—আরো একজায়গায় জিজ্ঞেস করা যাক।

চিতা তার লালাঝরা মুখটা আর একবার চেটে বেশ উদারভাবেই বলে, বেশ তো, জিজ্ঞেস করো আরো একজনকে। আবার হাঁটতে থাকে তারা।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা গেছে তারা। এমন সময় দেখতে পায় একটা শিয়ালকে। ওরা বলে, বেশ জিজ্ঞেস করা যাক এই শেয়ালটাকেই। এও যদি বলে একই কথা তাহলে আমরা আর রা-টি কাড়বো না।

শেয়ালও তাদের বিরুদ্ধে যাবে, এমনটি ধরে নিয়েই তারা বলে, শেয়াল ভাই, একটু দাঁড়াও না।

কেন, হয়েছেটা কি ?

একটা বিচার করে দেবে।

কিসের বিচাব ?

এই যে চিতাটা—চিতাটাকে দেখছ না, একে মেরে ফেলতে চাইছিল কিছু লোক। তাদের হাত থেকে আমরা একে বাঁচাই। তখন বলেছিল, আমরা যদি ওকে বাঁচাই তাহলে কখ্খনও খাবে না আমাদের। কিন্তু এখন বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে বলছে, আমাদের খাবে। তুমিই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে ? আমরা ওকে বাঁচালাম—আর ও আমাদের মারতে চাইছে।

শেয়াল এবার চিতার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, চিতামশাই, ঘটনাটা কি এইরকম, না অন্যরকম ? আসলে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস না করি তাহলে আপনি বলতে পারেন, এমনই বিচারক

আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না।—তাই না? দয়া করে বলুন, ঘটনাটা কি ঠিক ওইরকম না অন্যরকম?

না, ঘটনাটা ঠিক এই রকমই—এতটুকু জল মেশানো হয়নি এতে।

শেয়াল এবার ব্যাপারীদের বলে, আপনারা বললেন, চিতাকে আপনারা লুকিয়ে বন পার করে এনেছেন। এখন দয়া করে দেখান তো কেমনভাবে ওকে আপনারা লুকিয়ে এনেছিলেন? ওটা জানতে পারলেই আমরা জানতে পারব ঠিক ঠিক ব্যাপারটা।

আমরা ওকে একটা বস্তায় পুরে নিয়ে আসি।

শেয়াল আবার জিজ্ঞেস করে চিতাকে, আপনিই বলুন, সত্যিই কি বস্তায় করে লুকিয়ে এনেছিল এরা।

চিতা বলে, হ্যাঁ, ঘটনাটা ঠিকই, এতটুকু মিথ্যে নেই ওতে।

শিয়াল আবার গম্ভীরভাবে বলে ব্যাপারীদের, আচ্ছা ব্যাপারটা আমাকে একটু গুছিয়ে বলুন। বস্তায় পুরে এনেছিলেন তো একে? ঠিক কেমন ভাবে?

ব্যাপারীদের মধ্যে একজন যেন শেয়ালের কথার আসল মানেটা বুঝতে পারল। তাই তাড়াতাড়ি বস্তাটা নিয়ে চিতার কাছে গিয়ে বলল, তুমি একবার বস্তার মধ্যে ঢোকো তো, আমরা দেখিয়ে দি কেমনভাবে এনেছিলাম তোমাকে।

চিতা গুটি গুটি আবার ঢুকে যায় বস্তার মধ্যে। লোকটিও বস্তার মুখটা বেঁধে ফেলে বেশ জোরে। তারপর বলে, দেখুন, এইভাবে বস্তায় বেঁধে বলদের পিঠে চাপিয়ে ওকে আমরা নিয়ে এসেছি এখানে।

শিয়াল গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ খুব ভাল। আগে আমাকে ভাল করে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে দিন। বলতে বলতেই শিয়াল আবার

চোখ মটকায় সেই লোকটির দিকে—যে বুঝতে পেরেছিল তার কথাটা ঠিক ঠিক ভাবে।

আর সেই লোকটাও বিরাট একটা পাথর মাথার ওপর তুলে সোজা সেই চিতার মাথার ওপর ফেলে। এইবার বাকি যারা ছিল তারাও পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে চিতাকে। যতক্ষণ না চিতাটা মরল ততক্ষণ তারা পাথর ছুঁড়ে মারতেই থাকে।

শেয়াল এবার বলে, আমি যদি না থাকতাম তাহলে ও তোমাদের খেয়েই ফেলত। তাই না?

হ্যাঁ, সত্যিই খেয়ে ফেলত এই বদমাস চিতাটা। তুমি সত্যিই বাঁচিয়েছ আমাদের।

শেয়াল হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে। মনে রেখ, কোনো সময়েই দুর্জনের কথায় ভুলবে না। ভুললেই কিন্তু মরতে হবে।

ব্যাপারীরা বলে, আবার ভুলি। তারপর তারা ধরে রাস্তা আর শিয়ালও চলে যায় নিজের কাজে।

পেন্নাম তোমায় মরণআরক লতা

বউকে নিয়ে দূর গাঁয়েতে থাকত একটা লোক। একদিন ঝগড়া করে বউ তার চলে গেল বাপের বাড়ি। এমনটা হয়েই থাকে। আর বউ চলে গেলেই সবাই প্রায় তার পিছু পিছুই যায় শ্বশুরবাড়ি। তা এই লোকটিও করল তাই।

লোকটির শ্বশুরবাড়ি ছিল দূর গাঁয়ে। সেই গাঁয়ে যেতে পথে পড়ে একটা বন। সেই বনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় লোকটি। যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে সে দেখে অনেক মরণআরকের লতা। এ লতার পাতা খেতে ভারি মিষ্টি আর এর ডালপালা থেকে হয় ওষুধ।

লোকটি বনের মধ্যে সেই মরণআরকের পাতা তুলতে গিয়েও ভাবে, যাচ্ছি তো শ্বশুরবাড়ি। সেখানে জুটবে ভালমন্দ অনেক খাবার। তবে এখন কেন এসব হাবিজাবি খেয়ে পেট ভরাই। তার চেয়ে বরং খিদেটা আরো চাগুক। শ্বশুরঘরেই খাবো বেশ কব্জি ডুবিয়ে।

এইরকম সাতপাঁচ ভেবে লোকটি সেই মরণআরকের পাতা না খেয়েই চলতে থাকে। একসময় সে পৌঁছোয় তার শ্বশুরঘর।

জামাইকে সবাই খাতির করে বসতে দেয় চাটাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় রান্না। ডাক পড়ে খাবার। সে আর তার বউয়ের বড় ভাই হাত পা ধুয়ে খেতে বসে।

একথালা গরম ভাত আর সুন্দর মাংসর ঝোল দেখে জামাইয়ের মনে পড়ে যায় সেই মরণআরকের কথা। সে ভাবে তখন যদি বোকার মতো ওই গাছের পাতা খেয়ে পেট ভরাতাম তাহলে এখন এসব খেতাম কি করে? নিজেকে খুব চালাক মনে করে সে হঠাৎই হেসে ওঠে হো-হো করে।

খেতে বসে অমন হো-হো করে হাসতে দেখে তার বউয়ের দাদা কিন্তু যায় ক্ষেপে। সে ভাবে, আমরা কোথায় তোমার আদর যত্ন করে খেতে দিলাম, আর ও কিনা সেই খাবার দেখে হাসছে? আমাদের হেয় করছে।

কথাটা ভাবতেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় তার। লোকটি তখন সবে একগ্রাস ভাত মুখের কাছে তুলেছে কিন্তু তার বউয়ের দাদা ততক্ষণে তাকে কষিয়ে দেয় এক চড়।

তারপর একরকম ঘাড় ধরে তাকে তুলে দিয়ে বলতে থাকে সে, খিদের সময় আমরা তোমাকে খেতে দিলাম, আর তুমি কিনা হাসছ? আমাদের ব্যঙ্গ করছ? দেখাচ্ছি তোমাকে মজা। মারতে মারতে সে লোকটিকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে।

লোকটি আর কি করে। পেটে একটা দানাও পড়েনি। মাথার ওপরে আগুনের গোলা। ক্লান্ত পায়ে সে আবার হাঁটতে থাকে তার নিজের বাড়ির দিকে।

চলতে চলতে আবার সে পৌঁছোয় সেই বনে। আবার দেখতে পায় বনের সেই মরণআরক লতাকে। এবার সে আর ভুল করে না। সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করে সে লতাকে, বলে, মরণআরক লতাগো, তখন যদি তোমাকে অবজ্ঞা না করতাম, যদি তোমার পাতা

চিবুতে চিবুতে শ্বশুরবাড়ি যেতাম তাহলে আজ হয়তো আমার এই দুর্দশা হত না। জানো তো মরণআরক লতা, ঠেকে মানুষ শেখে। আর আমি তোমাকে কোনোদিন অবজ্ঞা করব না। বলেই সে চিবুতে থাকে সেই লতার পাতা।

ঠিক এরই জন্য লোকে বলে, পথে চলতে চলতে যদি মরণআরক লতা দেখ—তার পাতা ছিঁড়ে দিও মুখে। তা যদি না কর তাহলে রেগে যাবেন চান্দো দেবতা। বলবেন, ভারি বড় মানুষ হয়েছে দেখছি? মরণআরকের পাতা খায় না—দেখাচ্ছি মজা!

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকেই মানুষ মরণআরকের পাতা দেখলেই খায়। আর খেলে না—কোনো ঝামেলাতেই পড়তে হয় না তাকে।

যেমন মেয়ে তেমনি বাপ

লোকে বলে, সে—অনেক—অনেকদিন আগের কথা। এক বুড়ো ভিনগাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিল তার মেয়ের। তার গাঁ থেকে অনেক দূরে সে গাঁ। তাই বুড়ো খোঁজ নিতে পারত না মেয়ের।

সেই ভিন গাঁয়েতে বুড়োর মেয়ে জামাই ছিল বেশ সুখেই। তাদের তিন-চারটে ছেলে-মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু বুড়োর আর তাদের দেখাই হয়নি।

তা এক শীতের সকালে বুড়োর মনটা যেন কেমন কেমন করে। অনেকদিন সে দেখেনি তার মেয়ে জামাইকে—দেখেনি নাতি-নাতনিদেরও। তাই বুড়ো মনে মনে বলে, না, মেয়ে জামাইয়ের এবার খোঁজ নেওয়া উচিত। নাতি-নাতনিগুলো কেমন আছে তাও দেখা উচিত।

সত্যি কথা বলতে কি, যেমন ভাবনা—তেমনি কাজ। বুড়ো কিছু না খেয়েই সেই সাতসকালে রওনা হয় মেয়ের বাড়ি। ভাবে—জামাইবাড়ি পৌঁছে যাব রোদ চড়া হবার আগেই—ওখানেই খেয়ে নেব আমি। এই না ভেবে, লাঠিটা নিয়ে বুড়ো যায় মেয়ের বাড়ি।

গাঁয়ের পথ ছেড়ে বুড়ো ধরে বনের পাশের রাস্তা। যেতে যেতে বুড়ো দেখে জঙ্গলের ধারে পেকে রয়েছে অনেক পাকা ফল। খিদে পেলেও বুড়ো ভাবে, যাচ্ছি তো মেয়ের বাড়ি, সেখানেই খাবো ভালমন্দ—এসব বনের ফল খেয়ে কি হবে। এই না ভেবে বুড়ো এগিয়েই চলে।

একসময় বুড়ো পৌঁছোয় মেয়ের বাড়ি। বাবাকে দেখেই মেয়ে এগিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধোয়ার জন্য জল দেয়—বসার জন্য পেতে দেয় চাটাই।

বুড়ো হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে আলতো হাওয়া খেতে খেতে মেয়ের সঙ্গে গল্প করে। খিদেতে পেট তার চুঁই চুঁই করে—কিন্তু মেয়ে কোনো খাবার দেবার নাম করে না—বরং শুধু গল্পই করে যায়।

বুড়ো বুঝতে পারে না কি করবে? অনেকক্ষণ বাদে বুড়ো তার মেয়েকে বলে, অনেকদিন তোদের দেখিনি—তাই এলাম। তা এবার তাহলে উঠি, অনেকটা দূর আবার যেতে হবে আমাকে।

মেয়ে সে কথা শুনে বলে, একটু বোসো, আরেকটু গরম হোক।

বুড়ো ভাবে, মেয়ে বুঝি তার জন্য গরম গরম খাবার করছে। তার কথাই বলছে। তাই সে বেশ আয়েস করে বসে।

বুড়োর জামাই ছিল পাকা শিকারি। সেদিনও সে জঙ্গল থেকে একটা ময়ূর মেরে এনেছিল। শ্বশুরকে দেখে তাড়াতাড়ি ময়ূয়ের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটেকুটে জামাই একটা অন্য কাজে চলে যায়। মেয়ে কিন্তু রান্না চাপায়নি। এখন বাবাকে অমন গাঁট হয়ে বসতে দেখে মেয়ে ভাবে, বাবা দেখছি বেশ আয়েস করে বসেছে। এদিকে বাবা না গেলে রান্নাও চাপাতে পারছি না। কি করি?

পূবের সূর্য তখন ঠিক উঠোনের মাথার ওপর। জ্বলছে যেন আগুনের গোলার মতো। মেয়ে সেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের মাটিতে পা দেয়। পা যেন ছ্যাঁক করে ওঠে—গরমে মাটি তেতে লাল। মেয়ে তখন বাপকে বলে, এবার বেশ গরম হয়েছে, তুমি এবার তাহলে আসতে পার বাবা।

বুড়ো এতক্ষণে বুঝতে পারে গরম হওয়ার মানে। বুঝতে পারে—মেয়ে তাকে কোনো খাবারই দেবে না। তাই হতাশ ক্লান্ত বুড়ো লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এবার তাহলে চলি।

মেয়ে বলে, এসো বাবা।

জামাই যে ময়ুর মেরে তার মাংস কেটেকুটে রেখে গেছে তা দেখেছিল বুড়ো। কিন্তু মেয়ে সে-সব একা একা খাবার মতলব করেছে দেখে বুড়ো তাকে জবর শিক্ষা দেবার কথা ভাবে। তাই বুড়ো যেতে গিয়েও ফিরে এসে বলে, শোন মেয়ে, একটা কথা বলে যাই। জামাই আমার মস্ত শিকারি। তা ধর সে যদি কোনো ময়ুর মারে, কিংবা ওই ধরনের কিছু, তাহলে মহুয়ার খোল দিয়ে সেই মাংস রান্না করিস—দেখবি দারুণ স্বাদ হবে তার। অমন উপাদেয় জিনিস ছেড়ে আর কিছু খাবি না তখন তোরা।

ঠিক আছে বাবা, ওইভাবেই রান্না করব মাংস।

বুড়ো বলে, হ্যাঁ, তাই করিস। খেয়ে দেখবি কি আনন্দ—তখন আমার কথা বারবার বলবি তোরা।

আচ্ছা বাবা।

মেয়ের বাড়ি থেকে কিছু না খেয়েই ভুখা বুড়োকে এবার ফিরতে হল বাড়ি।

বুড়ো রওনা হতেই মেয়ে বসল রান্না করতে। বাপের কথা মতো মহুয়ার খোল দিয়ে রান্না করে ময়ূয়ের মাংস। মনে মনে ভাবে, আজ নতুন রকম রান্না এই মাংস খাইয়ে চমকে দেব সবাইকে।

অনেক বেলাতে ফিরে আসে মেয়েটির স্বামী। মেয়েটি এবার তার স্বামী আর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে খেতে দেয় ভাত আর মাংস। মুখে

তার বেশ একটা হাসি হাসি ভাব।

মাংস মুখে দিয়েই জামাই আর ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থু-থু করে ওঠে। তেতো-তেতো-বিষ তেতো একবারে মাংস। অমন মাংস কি খাওয়া যায়!

সবাইকে একসঙ্গে থু থু করতে দেখে একটু ঘাবড়েই যায় মেয়ে। কিন্তু কিন্তু করে বলে সে কেন, আজ তো নতুনভাবে দারুণ সুস্বাদু মাংস রেঁধেছি। আজকেই শিখলাম রান্নাটা। এভাবে রাঁধলে নাকি মাংসের স্বাদ দারুণ হয়, তাই—। আচ্ছা, দাঁড়াও তো, আমি নিজে একটু খেয়ে দেখি।

এক টুকরো মাংস মুখে দিয়েই সেও থু থু করে। তারপর বলে, বাবার এ কি আক্কেল, এ কেমন ধারা রসিকতা করল আমাদের সঙ্গে! যাওয়ার সময় বারবার করে বলল, মহুয়ার খোল দিয়ে মাংস রাঁধিস, দারুণ স্বাদ হবে, তাই আমি রাঁধলাম। আর সব মাংস এখন ফেলে দিতে হচ্ছে। বাবার দেখছি ভিমরতি ধরেছে—না হলে মেয়ের সঙ্গে এমন রসিকতা করে কেউ। কথাগুলি বলতে বলতে সে প্রায় কেঁদেই ফেলে।

জামাই এবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তোমার বাবাকে কিছু খেতে দিয়েছিলে তো?

না তো, কিছুই দিই নি আমি।

তাহলে ভুখাই চলে গেছে তোমার বাবা?

হুঁ, তাই গেছে।

তাই বল। সেইজন্যই তোমার বাবা তোমাকে এমন বিদ্ঘুটে রান্না শিখিয়ে দিয়ে গেছে। কেন, কেন খেতে দাওনি তোমার বাবাকে।

আচ্ছা, তুমি কেমন ধারা মেয়ে বল তো? নিজের বাবাকে পর্যন্ত তুমি খেতে দিলে না? তোমার মতো মেয়েমানুষ আমি জীবনে দেখিনি। নিজের বাবাকেই যদি না দাও, তাহলে আর কোন অতিথিকে তুমি দেবে। তুমি যাতে তাড়াতাড়ি রান্না করে তোমার বাবাকে দিতে পার, তারজন্য আমি ময়ূরের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটেকুটে রেখে গেলাম, আর তুমি সামান্য রান্নাটুকু পর্যন্ত করতে পারলে না! তুমি যেমন তোমার বাবাকে কিছু দাওনি, তেমনি তোমার বাবাও উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তুমি তাকে কিছু খেতে দাওনি বলেই, আজ আমরাও খেতে পেলাম না। দেখলে তো কেমন করে সবকিছু নষ্ট হল? যেমন বেআক্কেলে মেয়েছেলে তুমি, তেমন উচিৎ শিক্ষাই দিয়েছে তোমার বাবা।

একথার উত্তরে সে আর কিছু বলতে পারল না। তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে থাকল। ফেলে দিতে হল তাদের অত সাধের ময়ূরের মাংস।

মানুষরা সব কুকুর বেড়াল

সাঁওতাল বুড়োবুড়িরা বলে, অনেককাল আগে এক ছিল বামুন। বামুনের ছিল দুই বিয়ে। ভিক্ষে করেই বামুনের দিন চলত। তা বলে গরিব ছিল না সে মোটেই। কেননা, সবার কাছ থেকেই সে পেত কিছু না, কিছু। তবু শান্তি ছিল না তার ঘরে। দুই বামনিতে ঝগড়া লেগে থাকত নিত্যই। আর সে এমন ঝগড়া যে কাক চিলও বসত না বাড়ির চালে।

সেটা অবশ্য অন্য কথা। একদিন হঠাৎ-ই বামুনের মাথায় চাপল একটা খেয়াল। সে ভাবতে বসল, এই যে সবাই আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, এত ভিক্ষে দেয়, সে কী আমাকে, না, আমার এই পোশাককে?

বামুন ভাবে আর ভাবে। কিন্তু উত্তর পায় না। শেষে নিজেই বের করল একটা ফন্দি। সেদিন সকালে ভিক্ষেয় বেরোবার আগে তার ধুতি চাদর খুলে ছোট্ট একটুকরো নেকড়া জড়িয়ে নিল শরীরে। তারপর বেরিয়ে পড়ল ভিক্ষেয়।

বামুন সেদিন অবাক হয়ে দেখল, যারা তাকে রোজ শ্রদ্ধাভক্তি করত। তারা ভুলেও তাকাল না তার দিকে। ভিক্ষেও জুটল না এতটুকু। বামুন ঠিক করল, চেনা জায়গা ছেড়ে সে যাবে অচেনা গাঁয়ে। ভাল করে দেখবে ব্যাপারখানা কী?

তা, শহর ছেড়ে বামুন ঢুকল গাঁয়ে। সেখানেও সেই একই অবস্থা। তার পোশাক দেখে ভিক্ষে দেওয়া দূরে থাক, কেউ ফিরেও তাকায় না।

দিনের শেষে সন্ধ্যে নামে। বামুন ফিরে আসে শূন্য হাতে। তাই দেখে চিৎকার করে ঝগড়া জুড়ে দেয় দুই বামনি। বামুন কিন্তু চুপচাপ।

পরদিন সকালে উঠে বামুন বেশ ভাল করে সাজগোজ শুরু করে দেয়। সেই সকালেই স্নান সেরে চুলটা আঁচড়ে সে কাটে ফোটা তিলক। তারপর পরে পাটভাঙা একটা কাপড়। তার ওপর বেনিয়ান চড়িয়ে গায়ে চাদর দিয়ে বামুন রওনা হয় বাজারে।

অবাক কাণ্ড, কাল যারা ফিরেও তাকায়নি, তারাই ভক্তিতে একদম গদগদ। রাস্তার মধ্যেই অনেকে করে প্রণাম। দোকানদার চাইবা মাত্র দিচ্ছে জিনিস। বামুন সব দেখে আর মনে মনে হাসে।

বামুন এবার ভাবে, আচ্ছা, শহরের বাজারে তো যাচাই করা হলো ব্যাপারটা। এবার একবার দেখা যাক, গাঁয়ে কেমন করে লোকে।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। বামুন সেখান থেকে হাজির গাঁয়ে। সেই একই কাণ্ড। সবাই যেন উজাড় করে দিতে চায় তাকে। বামুন দেখে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। তার এই হাসির কারণ কিন্তু ধরতে পারে না কেউ।

সেদিনও সন্ধ্যের পর বামুন ফেরে ঘরে। ঝোলা থেকে বের করে নানা জিনিস। সব কিছু দেখে দারুণ খুশি দুই বামনি। সেদিন আর ঝগড়া নয়। বরং একটু যত্নআত্তিই করে বামুনকে। বামুন কিন্তু মনে মনে হাসে।

তারপর বামুন যা করল তাতে দুই বামনি অবাক। তারা ভাবে বামুনের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো। কিন্তু একটু পরে বামুনকে আবার সবকিছু ঠিক মতো করতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা।

আসলে বামুন করেছিল কী, তার সেইসব পোশাক-আশাক খুলে এক জায়গায় রেখে তার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলতে থাকে, হে পোশাক-আশাক, তোমরাই সব। লোকে খাতির করে তোমাদেরই, মানুষকে নয়। তাই হে পোশাক-আশাক তোমাদের জয় হোক, জয়—জয় হোক। এ পৃথিবীতে মানুষ দাম দেয় পোশাক-আশাককে, লোকের জ্ঞানবুদ্ধিকে নয়।

লোকে বলে, এরপর একদিন বামুন ভিক্ষে করতে যায় আরেক দেশে। সেখানে এক শহরে গিয়ে বামুন দেখে, মহামারী লেগেছে সেখানে। শ'য়ে শ'য়ে লোক মরছে। বামুন, কায়েত, গয়লা, হাড়ি, ডোম থেকে শুরু করে তেলি, তামলি ইত্যাদি নানা জাতের লোক মারা যাচ্ছে সেখানে। আর যারা বেঁচে আছে তারা টেনে সেইসব মড়াকে ফেলে দিচ্ছে এক জায়গায়। বামুনের পাশে পড়ছে হাড়ির মড়া, কায়েতের পাশে ডোমের, এমনি আর কী?

এত মড়া দেখে যেন মহোৎসব লেগে যায় শকুনিদের। যেমন মরছে মানুষ, তেমনি শ'য়ে শ'য়ে শকুনি আসছে সেখানে।

বামুন কিন্তু অবাক হলো অন্য আরেকটা ব্যাপার দেখে। শকুনি-গুলো বামুন কায়েতদের ভাল ভাল মড়া ছেড়ে আগে খাচ্ছে, নোংরা হাড়ি, মুচি, ডোমদের মড়া। বামুন তার অবাক হওয়ার ভাবটি আর চেপে রাখতে পারে না। বেশ জোরেই বলে ওঠে, কী আশ্চর্য ব্যাপার, শকুনিগুলো নেহাতই মূর্খ, নাহলে বামুন কায়েতদের ভাল ভাল পরিষ্কার মৃতদেহ ছেড়ে কেউ ওইসব নোংরা মড়া খায়।

এবার কিন্তু ঘটলো, আরো আশ্চর্যকরা ঘটনা। বামুন যে কথা-গুলো বলছিল, তা শুনতে পেল একটা বুড়ো মতন শকুনি। সে দিব্যি

মানুষের ভাষায় বলে ওঠে, ওহে কাছে এসো, আমি তোমাকে এর কারণটা বলে দিচ্ছি। বামুন আরো অবাক হল, তবু শকুনিকে কথা বলতে দেখে কেমন যেন একটু সাহস পেল তাই বলে, কাছে যাওয়ার কী আছে? তুমি বল না আমি শুনছি।

কিন্তু সব কথা তো সমান জোরে বলা যায় না; তুমি কাছে এলেই বলব কথাটা।

বামুন আর কী করে? বাধ্য হয়েই এগিয়ে যায় সেই বুড়ো শকুনির দিকে। বদগন্ধে গা যেন বমি বমি করে বামুনের। সে তাড়াতাড়ি বলে, বল কী বলবে?

শকুনি বলে, তুমি যা বললে তা আমি শুনতে পেয়েছি। তুমি জানতে চাইলে নোংরা অপরিষ্কার মড়া আগে খাচ্ছি কেন আমরা? দেখ, তুমি নোংরা মড়া দেখলেও আমরা কিন্তু হিসেব করে ঠিক ঠিক মড়াই খাচ্ছি।

শকুনির কথায় বামুন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ভাবে এ আবার কেমন ধারা কথা? খাচ্ছে যত রাজ্যের নোংরা মড়া আর বলছে অন্য কথা।

বামুনের মনের ভাব বুঝে শকুনি আবার বলে ব্যাপারটা কী জান, ভাল কুলে জন্মালেই ভাল শরীর হয় না। আসলে চান্দো দেবতা মানুষের শরীরে ভরে দেয় সব পশুর আত্মা। সেইমত আমরাও আগে খাচ্ছি মানুষকে আর যেগুলোকে তুমি বামুন কায়েতের শরীর বলছ, তা আসলে সব কুকুর, বেড়াল, শেয়ালের শরীর। ওগুলোকে রেখে দিচ্ছি পরে খাব বলে।

বামুন কিন্তু অবিশ্বাসের সুরেই বলে ওঠে ধ্যাৎ, তাও কখনও হয়।

বুড়ো শকুনি বলে, বেশ তো, শুধু আমার কথায় বিশ্বাস করে কাজ কী? ব্যাপারটা পরীক্ষা করেই দেখ না!

কী রকম?

কাছে এসো, সব বলছি।

বামুন এবার একটু ভয়ে ভয়েই আরো এগিয়ে যায় সেই বুড়ো শকুনির দিকে। শকুনি তার ডানা থেকে একটা পালক ছিঁড়ে দেয় বামুনকে। বলে, এটাকে চশমার মত চোখের সামনে রেখে দেখ, বুঝবে, কেন আমরা ওদের আগে না খেয়ে এদের আগে খাচ্ছি।

সত্যি সত্যি বামুন চোখের সামনে সেই পালক ধরতেই দেখে আসলে সে যাদের মানুষ ভাবছিল তারা এক-একটি কুকুর, বেড়াল, শিয়াল, এইসব আর কী।

বামুনের ওই আশ্চর্য হওয়া দেখে বুড়ো শকুনি বলে, ওই পালকটা রেখে দাও তোমার কাছে। এরপর যখন ভিক্ষে করতে বেরোবে তখন পালকটা গুঁজে রেখ তোমার মাথায়, তাহলেই দেখতে পাবে কোন কোন জাতের কে তোমাকে কী ভিক্ষে দিচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কী, শকুনিটা তার পালকটা সত্যি সত্যি দিয়েছিল বামুনকে। আর বামুনও যখন ভিক্ষেয় যেত পালকটা গুঁজে রাখত তার মাথায়। আর সত্যি সত্যি দেখত, যারা ভিক্ষে দিচ্ছে তারা কেউ বিড়াল, কেউ কুকুর, কেউ গরু আবার কেউ শিয়াল এই রকম সব নানা জাতের জন্তু জানোয়ার। দেখতো তারা তাকে বসবার জন্য যে চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে তা আনছে মুখে করে কামড়ে। ভিক্ষের থালাও আনছে সেইভাবেই।

লোকে বলে, ঘটনার শেষ এখানেই নয়। বামুন ঘরে ফিরে চোখের

সামনে সেই পালক রাখতেই দেখে তার দুই বৌয়ের একটি কুকুর আর একটি বিড়াল। ধিক্কারে বামুন ঘর ছেড়ে চলে আসে। ঘুরতে থাকে এখানে সেখানে।

কত জায়গাতেই না ঘোরে বামুন, কিন্তু মানুষ আর খুঁজে পায় না। দেখে মানুষের খোলসে সবাই এক একটি জন্তু। মনে মনে ভাবে বামুন, কেন এমন হয়? কত সাধের এই মনুষ্য জীবন আর তা কি না বয়ে বেড়াচ্ছে একটি পশুর আত্মা।

এইসব দেখতে দেখতে বামুন কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। সবসময় পালকটা চোখের সামনে রেখে সে ঘুবতে থাকে এ-দেশ সে-দেশ। ক্বচিৎ কোনো দেশে সে দেখে এক আধটা মানুষ।

লোকে বলে, এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে বামুন এক জায়গায় এক গয়লার মেয়েকে দেখে। তার মধ্যে ছিল মানুষের আত্মা। সেই মেয়েকেই বিয়ে করে বামুন। তারপর ঘরে এসে তাড়িয়ে দেয় তার প্রথম দুই বৌকে।

এইভাবেই মানুষের দেহের মধ্যে নাকি থাকে পশুর আত্মা। এটি সত্যি কী মিথ্যে তা জানা নেই, তবে লোকে এইরকম কথাই বলে থাকে। আর গল্পটাও শেষ হয়েছে এখানেই।

সাত ভাই এক বোন

এক রাজার ছিল সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটি ছিল সবার ছোট। রাজা তার সাত ছেলেরই বিয়ে দেয় সময় মতো। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেবার আগেই মারা যায় রাজা আর তার কিছুদিন বাদেই মারা যায় রাণীও। তাই সাত ভাইয়ের এক বোন থাকে তার দাদাদের কাছেই।

সাত ভাইয়ের বাবা রাজা হলেও তার রাজত্ব ছিল না মোটেই। আসলে সে ছিল জমিদার আর বড় বণিক। তাই তার ছেলেরাও দিন কাটায় ব্যবসা-বাণিজ্য করেই।

সেবার সাত ভাই গেল বাণিজ্য করতে। যাবার আগে তারা তাদের বোনকে রেখে বউদের বলে, খুব ভাল করে যত্নআত্তি করবে ওকে। মনে রেখ, ও কিন্তু আমাদের একমাত্তর ছোট বোন।

সাত ভাইয়ের সাত বউ বলে, সে-কথা কি আমরা জানি না, নাকি সে-কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে আমাদের। কোনো ভাবনা নেই, ও থাকবে আমাদের কাছে খুবই আদরযত্নে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সাত ভাই যায় বাণিজ্যে। আর তারপরেই সাত বৌদি মিলে শুরু করে তাদের সেই ছোট্ট ননদটির ওপর নানা অত্যাচার। একদিন একটা ফুটো কলসি দিয়ে তারা বলে, এই ছেঁদা কলসি করে আমাদের জন্য জল এনে ভর্তি করো এই চৌবাচ্চা। যদি না পার তাহলে মিলবে না কোনো খাবার-দাবার।

ছোট্ট মেয়ে কেঁদে বলে, কলসিতে যে অনেক ছেঁদা, এতে করে জল আনব কেমন করে ?

বৌদিরা বলে, তা জানি না, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো না হলে খাবার বন্ধ।

সাত ভাইয়ের সেই একটি মাত্র ছোট্ট বোন আর কি করে ? সেই ফুটো কলসি নিয়ে যায় পুকুরে। যতবার কলসি ভরে জলে অমনি ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে যায় সব জল। কয়েকবার চেষ্টা করেও জল ভরতে না পেরে কলসি পাড়ে রেখে কাঁদতে থাকে সেই মেয়ে—

ফুটো কলসিতে জল কেমনেতে ভরি
ফুটো কলসিতে জল কেমনেতে ভরি,
কত দূরে রইলা দাদা আমি কাইন্দা মরি।

ছোট্ট সে মেয়ের কান্না শুনে কষ্টে ভরে যায় সেই পুকুরের ব্যাঙ-গুলোর মন। তারা পাড়ে উঠে বলে, ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট মেয়ে, কাঁদছ কেন তুমি ? অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, এইভাবে বসে কেঁদে যাচ্ছ তুমি। বলি কি হয়েছে ?

ছোট্ট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বলে, হবে আর কি, আমারই কপাল খারাপ। সাত দাদা গেছে বাণিজ্যেতে। এখন সাত বৌদিতে এই ছেঁদা কলসি দিয়ে পাঠিয়েছে জল ভরে নিয়ে যাবার জন্য। জল না নিয়ে গেলে খেতে দেবে না। একটা ফুটো হলে না হয় হাত চেপে ধরে নিয়ে যাই, কিন্তু এযে একবারে ঝাঁঝরা—তাই কাঁদছি দুঃখে।

ব্যাঙগুলো বলে কেঁদ না তুমি। জলের সঙ্গে আমাদেরও ভরে নাও কলসিতে। ওই ফুটোয় চেপে বসে থাকব আমরা, এক ফোঁটা জলও পড়বে না। বাড়ি গিয়ে ঝপ করে জলটা ঢালবে না—আস্তে ঢেল—

তাহলেই আমরা সময় মতো বেরিয়ে যাব কলসি থেকে।

ব্যাঙেদের কথায় ভারি খুশি সেই ছোট্ট মেয়ে। কলসিতে জল ভরে সে, সঙ্গে ব্যাঙও। তারপর কসলি তুলে নেয় মাথায়। বাড়ি গিয়ে আস্তে ঢালে জল। কাণ্ড দেখে বৌদিরা অবাক। কলসি কেড়ে নিয়ে দেখে তা আছে যেমনকার তেমনই। মুখ কালো হয়ে যায় তাদের।

পরদিন আবার তারা বলে সেই মেয়েকে, আজ জঙ্গল থেকে নিয়ে এসো অনেক অনেক পাতা, কিন্তু খবরদার, পাতাকে বাঁধতে পারবে না মোটেই। না বেঁধে আনতে হবে সে পাতার বোঝা।

বনে গিয়ে অনেক পাতা কুড়োয় সে মেয়ে। কিন্তু না বেঁধে আনবে কি করে তা বুঝে পায় না কোনো মতেই। তাই পাতার স্তুপের কাছে বসে কাঁদতে থাকে সে মেয়ে। কান্না তো নয়, যেন এক করুণ সঙ্গীত—

বিনা দড়িতে এই পাতা নেব কেমন করে
না বাঁধিয়া এই পাতা নেব কেমন করে,
কাইন্দা মরি ওরে দাদা তোরা কত দূরে।

মেয়ের সে কান্না শুনে গাছ থেকে নেবে আসে এক লাউডগা সাপ। সে বলে, কি হয়েছে মেয়ে তোমার, তখন থেকে কাঁদছ কেন এমন করে?

ছোট্ট মেয়ে শোনায় তার দুঃখের কথা। শুনে লাউডগা সাপ বলে, এই কথা। এক কাজ কর তুমি, আমার ওপর রাখ পাতার বোঝা, আমি জড়িয়ে রাখব পাতা। বোঝা নিয়ে আস্তে রাখবে মাটিতে— আমি চলে যাব আমার জায়গায়।

খুশি হয়ে ছোট্ট মেয়ে পাতা রাখে সেই লাউডগা সাপের ওপর।

পাতার বোঝা জড়িয়ে রাখে সাপ। মেয়ে নিয়ে যায় পাতার বোঝা বাড়িতে। বৌদিরা কাছে আসার আগেই গুটিয়ে পাতার নিচে চলে যায় সাপ—তারা বুঝতেও পারে না।

ছোট্ট মেয়েকে এবারেও জব্দ করতে না পেরে রাগ হয়ে যায় বৌদিদের। পরদিন তারা বলে, আজ জঙ্গল থেকে নিয়ে এস রান্নার কাঠ। মনে রেখ দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারবে না তা।

কি করে সেই মেয়ে। জঙ্গলে গিয়ে শুকনো দেখে দেখে অনেক কাঠ জড়ো করে সে। কিন্তু ওই কাঠের বোঝাকে না বেঁধে যতবার মাথায় তুলতে যায় অমনি তা পড়ে যায় চারদিকে। তাই আবার সেই মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে গায়—

বিনা বাঁধায় কাঠ নি কেমনে
বাঁধন বিনা কাঠ নি কেমনে
কত দূরে দাদা, কাঁদে তোর বোনে

সেই মেয়ের কান্না শুনে গাছ থেকে নেমে আসে এক ময়াল। বলে, কাঁদছ কেন মেয়ে, কি হয়েছে তোমার?

সাত ভাইয়ের সেই এক বোন বলে তার দুঃখের কাহিনী। সব শুনে ময়াল বলে, এই কথা, এর জন্য ভাবনা কি? আমার ওপর রাখো কাঠ, আমি জড়িয়ে রাখবো কাঠ। তবে হ্যাঁ, আস্তে নামাবে বোঝা। আমি ঠিক চলে যাব।

সেইমত কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি আসে মেয়ে। আস্তে নামায় কাঠ। ময়াল সরসর করে চলে যায়। বৌদিরা ভাবে, এতো বড় সাংঘাতিক মেয়ে। কোনোমতেই জব্দ করা যায় না একে। কেমন ভাবে, কেমন ভাবে জব্দ করা যায় এই মেয়েকে তারই তাল খোঁজে

তারা।

সেদিন সবাই মিলে তারা যায় বনে। বনের মাঝে মস্ত এক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ। তার ফুল দেখে লোভ হয় বৌদিদের। তারা গাছে উঠে পাড়তে যায় ফুল, কিন্তু পারে না।

তখন সাত বৌদি মিলে একরকম জোর করেই ঠেলে তুলে দেয় সেই মেয়েকে গাছের ওপর। বলে তাকে, গাছ থেকে ফুল পাড় তুমি।

সেই মেয়ে যখন ফুল পাড়ে, তখন সাত বৌদি কোথা থেকে সব কাঁটা গাছ এনে সেই গাছের গায়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দেয়। তারপর গাছের ওপর সেই মেয়েকে রেখে চলে যায় ঘরে।

গাছ থেকে নামতে পারে না। বসে থাকে সে সেই গাছেই। কান্নায় কান্নায় একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে জন্তুর ডাকে ঘুম ভাঙে। শক্ত করে ধরে থাকে ডাল। কোনোরকমে নিজেকে আটকে রাখে তিন ডালের ফাঁকে।

কেটে যায় দিন। না খেয়ে খেয়ে মেয়েও যেন কেমন হয়ে যায়। আর জোরে কাঁদতেও পারে না সে। এমনি সময়ে তার সেই সাত ভাই বাণিজ্য সেরে ফেরে দেশে। বাড়ি ঢোকার আগে বনের মধ্যে সেই মুচুকুন্দ গাছের তলাতেই বসে।

গাছের ওপর থেকে দেখে সেই মেয়ে। কিন্তু দাদাদের ডাকার মতো গলার জোর তার নেই। তাই নীরবে শুধু কেঁদে যায়। তার সেই কান্না এসে পড়ে তার দাদাদের গায়ে।

বড় ভাই বলে, দেখ তো, গায়ে যেন কি পড়ল ?

অন্যরা দেখে বলে, এ দেখি চোখের জল। যেন আমাদের সেই ছোট্ট বোনের।

সাত ভাই তাকায় ওপরের দিকে। দেখে ডালের ফাঁকে আটকে রয়েছে তাদের বোন। তাড়াতাড়ি কাঁটা সরিয়ে ওপর থেকে নামিয়ে আনে তাকে।

কোনো কথা বলার মতো ক্ষমতা নেই তখন মেয়ের। তাই তাকে তারা কিছু খেতে দেয়। খেয়েদেয়ে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে সে মেয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে দাদাদের বলে সব কথা। তা শুনে রাগে যেন রক্ত ফোটে সবার। বলে ব্যবস্থা হচ্ছে এবার।

বোনকে তারা ভরে নেয় একটি বস্তার মধ্যে। তারপর আস্তে করে বলদের গাড়িতে চাপিয়ে তারা ফেরে বাড়ি।

সাত ভাইকে ফিরতে দেখে সাত বউয়ের ভারি আহ্লাদ। তারা এসে বরণ করে তাদের। সাত ভাই কিন্তু বলে, কই আমাদের বোনকে তো দেখছি না! সে গেল কোথায়?

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সাত বউ। বলে, কি জানি, একদিন বনের মধ্যে গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল। কত খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না তাকে।

সে কথা শুনে গুম হয়ে যায় সাত ভাই। চুপ করে থেকে তারা শুধু বলে হুম্।

বোনকে তারা বস্তার মধ্যেই রেখে দেয়। রাতে খাবারও দেয় চুপিচুপি।

পরদিন সকাল হতেই সাতসাতটা বড় বড় কুয়ো কাটায় তারা। সাত বউকে সাত ভাই বলে, এতদিন বাদে তারা ফিরল, তাই নতুন করে বিয়ে হবে তাদের।

পুজো হয়, বাদ্যি বাজে। সাত ভাই সাত বউকে নিয়ে দাঁড়ায় সেই

কুয়োর পারে। তারপর একসময় সাত ভাই সাত বউকে ঠেলে ফেলে দেয় সেই কুয়োর মধ্যে। কুয়ো থেকে উঠতে পারে না তারা।

সাত ভাই তাদের বোনকে বস্তা থেকে বের করে নিয়ে এসে বলে, এবার দেখ এই বজ্জাত বউদের সাজা।

বেশ কয়েকদিন সেই কুয়োর মধ্যে থেকে, না খেতে পেয়ে বউরা যখন প্রায় মরতে বসেছে সেইসময়ে তারা তুলে আনে তাদের। তারপর থেকে আর কোনোদিন সেই সাত বউ খারাপ ব্যবহার করেনি সেই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে।

দুই ভাই

ওরা ছিল দুটি ভাই। এক গাঁয়েতে একই সঙ্গে ওদের বাস। সম্পত্তি যা ছিল—দুই ভাইতে তাই ভাগ করে নিয়ে তা একরকম সুখেই কাটাচ্ছিল দিন।

একটার বেশি যা ছিল তা ভাগ করা ছিল সহজ। কিন্তু যা ছিল একটা, তার ভাগও করে নিয়েছিল নিজেদের নিয়ম মতোই। ভাগের নিয়মে বড় ভাই সবসময়ই জিতত, কেন না ভাগের ব্যাপারে তারই যে ছিল আগে কথা বলার অধিকার। তা সে-রকম সম্পত্তির মধ্যে ওদের চাদর ছিল একটা। ওই একটা চাদরকেই ভাগ করে ব্যবহার করত ওরা। ভাগ করে মানে, দিনের বেলা চাদরটা গায়ে দিত বড় ভাই আর রাতের বেলা আরেকজন।

দিনের বেলা চাদরটা গায়ে দিত যে ভাই, সে করত কি দিনের শেষে চাদরটা বিছিয়ে রাখত চোরকাঁটার ওপর। ফলে, রাতে যে ভাইয়ের ভাগে পড়ত চাদর সে আর গায়ে দিতে পারত না, রাত-ভর সে শুধু চাদর থেকে বাছত চোরকাঁটা।

শুধু চাদর নয়, তাদের দুজনের ছিল মাত্র একটাই গরু। এই গরুটাকেও তারা ভাগ করে নিয়েছিল। গরুর পেছনের অংশটা ছিল বড় ভাইয়ের আর সামনের অংশটা ছোট ভাইয়ের।

এখন গরুর যখন বাছুর হত তখন সেটা পেত পেছনের অংশের মালিক, দুধও পেত সে। ছোট ভাই যদি কখনও দুধ দুইতে যেত

অমনি বড় ভাই তাড়া দিত, এই আমার অংশে হাত দিচ্ছিস কেন? পেছনের অংশটা আমার না!

বেচারা ছোট ভাই আর কী করে? মুখ ভার করে দাদাকে দুধ দুইতে দেখে আর তাকে জব্দ করার মতলব ভাঁজে।

তা একদিন পেছনের অংশের মালিক বড় ভাই যখন দুধ দোয়াতে বসল তখন সামনের অংশের মালিক ছোট ভাই এসে বলল, আমি এবার গরুর আমার অংশটাকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বলেই ঘাড়ের দিকে জোরে জোরে মারে ছিপটি। ফলে পেছনের অংশের মালিক আর কিছুতেই দুধ দোয়াতে পারে না। গরু ছুটতে থাকে সামনে।

রেগে গিয়ে সেই ভাই বলে, এই তুই গরুটাকে মারছিস কেন? দেখছিস না, আমি দুধ দোয়াচ্ছি।

ছোট ভাই ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, কেন, আমি তো তোমার গরুকে মারছি না। আমি তো আমার অংশের গরুটাকেই মারছি। তাই না? বলেই আবার মারে ছিপটি। উল্টে পড়ে দুধের বালতি।

এইভাবে দুই ভাইয়ের কেউই পায় না দুধ। তবু তাদের মধ্যে ছিল ভারি মিল। ওই একটি গরু আর একটি চাদর নিয়ে বেশ সুখেই ছিল সেই দুই ভাই।

রাক্ষস আর রাম লক্ষ্মণ

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই। ওরা শিকারে বেরিয়েছে। দেশের পর দেশ চষে বেরাচ্ছে ওরা। রাজ্যের যত বড় বড় জানোয়ার সব মারা পড়ছে ওদের হাতে। আর রাক্ষস, হ্যাঁ, পুরনো সেই দিনগুলোতে ছিল অনেক, অনেক রাক্ষস। তারা মানুষ খেয়ে খেয়ে দেশের পর দেশ করে তুলেছিল শ্মশান। তা সেই সময় জন্মাল রাম লক্ষ্মণ এই দুই ভাই। মস্ত বীর। তারা তাদের তীর ধনুক দিয়ে রাক্ষস জাতটাকেই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল পৃথিবীর বুক থেকে।

তা সেবার কোনো এক দেশে তারা মারল ইয়া বড় এক রাক্ষস। রাক্ষসটাকে মেরে তার থাবার ডগাটুকু কেটে নিয়ে তারা চলে যায় অন্য জায়গায়।

এদিকে হয়েছে কি, রাম লক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পরই এক ঘটি জল নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল এক ডোম। সে ওই রাক্ষসটাকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে না ওটা জ্যান্ত কি না! দূর থেকেই ভাল করে সে দেখে। দেখে রাক্ষসটা পড়ে আছে চিৎপটাং হয়ে। নড়েও না চড়েও না। তাই দেখে ডোমের বেশ সাহস বেড়ে যায়। সে বুঝতে পারে রাক্ষসটা মারা গেছে। আর তাতেই তার মনে দেখা দেয় লোভ।

লোভটা আসলে রাজা হবার—রাজকন্যাকে বিয়ে করার। সে দেশের যে রাজা—তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে রাক্ষস মারতে পারবে

তার সঙ্গেই দেবেন মেয়ের বিয়ে, আর দেবেন রাজত্বের কিছুটা। তাই ডোম আশায় আশায়, আবার ভয়ে ভয়েও, ঘটিটা রেখে অনেক কষ্টে বিরাট একটা পাথর মাথার ওপর তুলে সোজা ফেলে রাক্ষসটার মাথার ওপর।

থেৎলে যায় রাক্ষসের মাথা, তবু সে নড়ে না। ডোম আবার একটা পাথর তুলে গায়ের জোরে মারে রাক্ষসকে। এবারও নড়ে না রাক্ষস। ডোম তখন নিশ্চিত, মারা গেছে রাক্ষসটা।

ডোম এবার ছোটে বাড়িতে। তাড়াতাড়ি একটা বিরাট ছুরি নিয়ে এসে সে কেটে নেয় রাক্ষসের থাবা। তারপর রাজকন্যাকে বিয়ে করার স্বপ্নে বাড়িতে এসেই তাড়িয়ে দেয় তার বউ ও ছেলেমেয়েদের। রাস্তায় ফেলে দেয় ঢোলকটা—তারপর বগল বাজাতে বাজাতে হাজির হয় রাজসভায়।

রাজাকে রাক্ষসের থাবা দেখিয়ে বলে, আমি মেরেছি বিরাট এক রাক্ষসকে। আমাকে রাজকন্যা আর রাজ্যের একটা অংশ দিন।

রাজা বলেন, রসো—রসো। তুমি বলছ, রাক্ষস মেরেছ, তার থাবাও দেখাচ্ছ। কিন্তু থাবার ডগাটা দেখছি কাটা। আমার মনে হয় তুমি নয়, অন্য কেউ মেরেছে রাক্ষসটাকে।

ডোম হাত জোর করে তাড়াতাড়ি বলে, না রাজাসাহেব, আমিই মেরেছি রাক্ষসটাকে। বিশ্বাস না হয়, চলুন আমার সঙ্গে। এখনও পড়ে আছে সেটা। জঙ্গলের পাশে ওই রাস্তাটার ধারে।

রাজা বলেন, তোমার সব কথাই শুনলুম। সত্যিই যদি তুমি রাক্ষস মেরে থাক তাহলে পাবে রাজত্ব আর রাজকন্যা। কিন্তু তার আগে আমাকে ভালভাবে ব্যাপারটা জানতে দাও।

রাজা ব্যাপারটা খোঁজ নিতে পাঠালেন লোক। তারা গিয়ে দেখে রাস্তার ধারে সত্যি সত্যি রাক্ষসটা পড়ে আছে। তার মাথাটা গেছে থেৎলে। হাতের থাবাটাও কাটা, কিন্তু বুকে বিঁধে রয়েছে তীর। তাই সন্দেহ বাড়ে তাদের। ভাল করে তত্ত্বতল্লাস করতে করতেই পেল তারা তুই ভাই রাম আর লক্ষ্মণকে। তাদের কাছেই শুনল সব। তারপর নিয়ে এল তাদের রাজসভায়। তারা এসে রাজাকে দেখাল সেই রাক্ষসের থাবা। সবকিছু দেখে রাজা ভারি খুশি। আর সেই সঙ্গে মিথ্যে বলার জন্য তাড়িয়ে দিলেন সেই ডোমকে রাজসভা থেকে।

বেচারি ডোম। রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভে সে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল তার বউ আর ছেলেমেয়েদের। এখন তাদেরই আবার তোষামোদ করে ঘরে ডেকে আনে। সেই সঙ্গে রাস্তা থেকে আবার তুলে আনে তার পুরনো সেই ঢোলটা।

রাজা ওদিকে রাম লক্ষ্মণকে বলে, তোমরা তুজনে রাক্ষসটাকে মেরেছ জেনে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার। আচ্ছা, এর জন্য তোমরা কি চাও বল তো?

রাম লক্ষ্মণ বলে, আমরা কিছুই চাই না। আমরা শুধু আপনাকে এগুলো দেখাতে নিয়ে এলাম।

রাজত্ব আর রাজকন্যা ঘরেই থেকে যাওয়ায় এক বুক আনন্দ নিয়ে রাজা তখন তাদের বিদায় জানালেন। রাম লক্ষ্মণও চলে গেল আরেক দেশে।
